# মনভূমি

মনন দাস

# মনভূমি

মনন দাস

পরিবেশক
লিপিকা
৩০/১এ, কলেজ রো
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

**Manabhumi**
A romantic novel by Manan Das

প্রকাশক ঃ মহামায়া দাস
৬০/২, ব্যানার্জী বাগান লেন
সালকিয়া, হাওড়া - ৭১১ ১০৬



প্রচ্ছদ ঃ শ্রী সুদীপ

ই-বুক প্রকাশ ঃ লিটল ম্যাগাজিন মেলা, ২০২২, রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গন

মূল্য ঃ ২০০্ টাকা মাত্র

*এই লেখকের কিছু বই ঃ*

**উপন্যাস -**

মন এক উষ্ণ প্রস্রবণ

ঝল্‌মলি

ছুট

**গল্প সংকলন -**

অন্য স্বাদ

**কিশোর উপন্যাস -**

রাজু নারানের কীর্তি

ছড়ায় লেখা মজার গল্প

আট্‌টা ঠাট্‌টা

**কবিতা -**

কবিতা সংগ্রহ

White Flowers

## উৎসর্গ

একান্ত ভালোবাসার মানবীকে

নগ্ন দেহে হেঁটে যাই কোন কোন সময় স্বপ্ন মধ্যে। আমার দু'পাশে মানুষজন চেয়েও দেখে না।

হাঁটতে হাঁটতে পেরিয়ে যাই জনপদ। ক্রমশঃ হারিয়ে যায় পথঘাট। চারপাশে চুপিসাড়ে জেগে ওঠে বনভূমি। এলোমেলো হাঁটি। দু'পাশে গাছেরা পাতার ঝালর দোলায়। পায়ের নীচে কখনও ঘাস কখনও মাটি। কিছু কিছু শব্দ শুনি পাখীদের। কিছু কিছু শব্দ শুনি ঝরণার। আলোতে সবুজ ছায়া।

মনে হয় কাকে যেন খুঁজতে বেরিয়েছি। ভাবতে ভাবতে গভীর হতে গভীরতর অরণ্যে চলে যাই। বুকের মধ্যে অঙ্কুরোদ্গমের মতো ব্যথা— সহসা দেখি তুমি অরণ্য নির্জনে সবুজ ছায়ায় পবিত্র পুষ্পের মতো ফুটে আছ। ঠিক তখন আমি বুঝতে পারি সব তৃষ্ণা একাগ্র হলে বুকে অঙ্কুরোদ্গমের ব্যথা জন্ম নেয়।

ইদানিং এই স্বপ্ন মাঝে মাঝে দৃশ্য সাজিয়ে দেয় ঘুমের মধ্যে, এই স্বপ্ন মাঝে মধ্যে অনুভবে কর্ষণ করে যায়। গতকাল শেষ রাতে এই স্বপ্ন একইভাবে এসেছিল....

আমার শান্ত জীবনে এখন এভাবেই দাঁড়িয়ে আছি উত্তর তিরিশে। এই যৌবন...এই দুর্লভ যৌবনকাল এভাবে কি চলে যাবে? কোন এক মানবী— যে নেবে একান্ত ভালবাসা সে যদি শুধুই থাকে স্বপ্নের আড়ালে— উত্তর তিরিশ থেকে ক্রমে এগিয়ে যেতে হবে অবরোহণের পথে...যৌবনের কাল শেষ...

ওই আশ্চর্য স্বপ্ন ইদানিং আমাকে দিয়েছে এ সকল ভাবনা, নাড়া দিয়েছে শান্ত জীবনে। প্রকৃতির এই বিশাল রাজত্বে সৃষ্টির আদি থেকে হয়ত চিরকাল এভাবেই জেগে উঠেছে তৃষ্ণা প্রতিটি প্রাণে। মানুষ মানুষী পশু পাখী কীট পতঙ্গ লতা বৃক্ষ তৃণ গুল্ম—হয়তো বা মাটি জল বাতাসেরও প্রাণে...

কিন্তু কি করার আছে? আমি চাই— সব আকুলতা নিয়ে চাই, কিন্তু পাওয়া সে তো আমার আয়ত্বাধীন নয়।

আমার অজান্তে আমারই বুকের মধ্যে দেখছি বহুদিন ধরে জমে উঠেছে তৃষ্ণা...সে তৃষ্ণা একাগ্র হয়ে আজ আমাকে—

গত রাতে ঘুম হয়েছিল খুব ভাল। যদিও গাঢ় ঘুম আমার খুব কমই হয় তবু কাল যেহেতু অনেক রাতে বৃষ্টি নেমেছিল অতএব সারা বৈশাখের তীব্র দহন এক বৃষ্টিতেই সিক্ত, ঠাণ্ডা বাতাস জুড়িয়ে দিয়েছিল শরীর।

আজ সকাল খুব সুন্দর। জানালার ওপারে পাঁচিলের ওপরে বটের ধোয়ামোছা পাতায় মুখ ঘসছে শান্ত রোদ। একটা চড়ুই পাখী মেঝেতে কি যেন খুঁজছে এবং আমি তক্তাপোষে আধশোয়া। আর কেউ নেই। আর কোন শব্দ নেই। শুধু আমার নিঃশ্বাসের শব্দ, আমার হৃদস্পন্দনের শব্দ।

বটের শিশু ক্রমশঃ দেখছি কিশোর হয়ে উঠেছে। এখন এই মুহূর্তে তুমি ওই গাছের গভীরে চলে গেলে বুঝে নেবে কি সক্রিয় তার আপাতদৃষ্ট ওই শান্ত শরীর। সংগ্রহ করছে জলকণা শোষক শিকড়, পাতায় পাতায় শিরায় শিরায় শুরু হয়ে গেছে ব্যস্ততা রৌদ্র থেকে সংগ্রহ করে নিতে বাঁচার উপাদান।

এভাবে একদিন কিশোর বট বৃক্ষ হবে... মুচড়ে ভেঙে দেবে ওই ইঁটের গাঁথুনি।

বড় হও—বট—বড় হও—অনেক অনেক বড়ো—বৃক্ষ হও— আমি তোমাকে মৃত্যু দেবোনা। আমি জানি একদিন মানুষকে বৃক্ষের জন্য কাঁদতে হবে।

আজকের সকাল বড়ো সার্থক সকাল। আজকের সকাল থেকে সময় বিশেষ কিছু কর্জ নিতে পারেনি।

সময় প্রতি মুহূর্তে তোমার থেকে কিছু কর্জ নিচ্ছে এবং তোমাকে নিঃস্ব করছে। যখন তুমি অর্থহীন কাজে ব্যস্ত থাকো এবং তোমার পাশ দিয়ে অলক্ষ্যে বয়ে যায় প্রাণপ্রিয় নদী বুঝতেও পারো না সময় তোমার সঙ্গে জালিয়াতি করছে।

জালিয়াত সময় শুধু কর্জ নিয়ে যায়। এই ধার কোনদিন সে শোধ দেবে না। অতএব খুব সাবধানে ধরে রাখো মুঠি। যদিও তা সত্ত্বেও সময় ছিনিয়ে নেবে, তবু যত বেশি পারো আত্মস্থ করে নাও এই আনন্দমেলা।

এই শরীর— হাত-পা-মুখ-দাঁত-লিঙ্গ— প্রতিটি অঙ্গ বহু ব্যবহারে ক্রমশঃ বিক্ষত। এভাবেই একদিন জীর্ণ হতে জীর্ণতর শরীরে পলি জমে জমে সব স্রোত রুদ্ধ হয়ে যায়।

কে কড়া নাড়ছে? আমি তো কাউকে আসতে বলিনি। আমার কাছে কারও কোন দরকারও নেই। সময় সারাক্ষণ জালিয়াতি করার জন্য পিছু নিয়ে আছে।

একমুঠো ডুমুর ছিল, দুটো ডিম, ক-আঁটি লাউ শাক, কয়েকটি কাঁচা আম ছিল, আর ছিল কি আশ্চর্য ফল— চারটে গোলাপজাম। এই সব সওদা সাজিয়ে বসেছিল কিশোরী মেয়েটি। মাটির গভীরে থাকে যে মাটি সেই মতো কালো তার রঙ, তেমনই নরম তাকে দেখতে।

বাজারে ঢোকার মুখে রাস্তার ধারে বসেছিল সে। কি আশ্চর্য দুর্লভ বস্তু নিয়ে বসেছিল।

আমি তার থেকে ডুমুর কিনলাম, দুটো ডিম কিনলাম, এক আঁটি লাউশাক আর দুটো কাঁচা আম, আর কিনলাম গোলাপজাম চারটি। কাঁচা সোনার মতো রঙ ফলগুলি হাতে নিয়ে আমি গন্ধ শুঁকলাম— কি মধুর গন্ধ।

দাম দিতে দিতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম— কোথায় বাড়ি?

ছায়া ছায়া চোখ তুলে সে বলল— বেগমপুর।

—সে কতদূর?

—এইতো এখান থেকে হেঁটে লিলুয়া ইষ্টিশন যাবো—সেখান থেকে রেলে আধঘণ্টা।

মাত্র আধঘণ্টা ট্রেনে চেপে তুমি যেতে পারো সেই আশ্চর্য ভুবনে যেখানে এমন ফল নুয়ে থাকে গাছে, পাতিহাঁস সাঁতরিয়ে পেরিয়ে যায় পুষ্করিণী— পাড়ে উঠে ডানা ঝাড়ে, বাঁশবনে হাওয়া শিরশির, কাঠবাদামের ডালে ছুটে উঠে যায় কাঠবিড়ালী।

—বলতো মা বাজার থেকে আজ কি এনেছি?— বাড়ি ফিরে বাজারের ব্যাগ নামাতে নামাতে আমি বললাম।

—কি এনেছিস? —মা জিজ্ঞাসা করল। আমি সাত তাড়াতাড়ি গোলাপজাম বার করে দেখাই।

—ওমা তাইতো! কোথায় পেলিরে? মাত্র চারটে এনেছিস কেন, বেশি করে আনতে পারলিনা?

—মাত্র চারটেই যে ছিল মা— বললাম আমি— গ্রাম থেকে একটা ছোট মেয়ে এটা সেটা কুড়িয়ে বাড়িয়ে বিক্রি করতে এনেছে। ঠিক আছে তুমি দুটো আমি দুটো, আমি তিনটে নোবো না।

মা হেসে অস্থির— তুই চারটেই খা-না, অমনই শুরু হয়ে যায় মায়ের স্মৃতিচারণা— আমার ছেলেবেলায় কতো খেয়েছি রে— ওই যে নিমে—

...চারদিকে পোড়া চিতাকাঠ। বাতাসে চামসে গন্ধ। আকাশ ধোঁয়ায় ভরে থাকে। খাঁই খাঁই করে কোথা যেন চেঁচিয়ে ওঠে কুকুর। আকাশ থেকে ঝুপ ঝুপ করে খসে পড়ে অনেক মরা ব্যাঙ। মুহূর্তে সাদা সাদা পোকায় থিক্ থিক্ চারিদিক। আমার হৃদপিণ্ড খুলে নিয়ে কে যেন বিশাল হাতে ছুঁড়ে দেয় পোকাদের স্তূপে—কুরে কুরে খায় পোকা— যন্ত্রণায় অস্থির আমি দেখি...

কয়েক মুহূর্তে এইসব আমি দেখি কিংবা এরকম মনে হয় আমার। কেন যে এমন হয়! এরকম হলে আমি দাঁতে দাঁত চাপি, পায়ের পাতা দৃঢ় চেপে রাখি মাটিতে এবং ক্রমশঃ স্বাভাবিক।

মায়ের কণ্ঠস্বর আবার শুনতে পাই— বোশেখ মাসের বিকেলে আকাশ কালো করে আসতো ঝড়— সে কি মেঘ! তেমন কাল বোশেখী ঝড়বৃষ্টিই আজকাল হয় না! একটু পরেই আবার ঝলমলে রোদ, তখন ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতুম গাছতলায়। গাছের

তলায় ফল থৈ থৈ। পাশের নালা দিয়ে কুলকুলিয়ে বয়ে যেত বৃষ্টির জল— জামরুল ভেসে যেত তুললে হবে ঝোড়া ঝোড়া! কে খায়!

— আমি মাকে থামিয়ে বলি— কার নামে কি যেন বলছিলে— ঐ যে নিমে—

— নিমে কিরে? নিমাই কাকা বল্ মা শুধরে দেয়।

বাঃ! তুমিইতো বললে নিমে—

— আমি বললুম বলে তুইও বলবি?

— তা ঠিক আছে নিমাই কাকা— এবার বলো—

— বলছিলাম কি ওদের বাগানে একটা গোলাপজামের গাছ ছিল।

— কোথায় ওদের বাগান?

— ওইতো রে—গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোডের ওপারে। ওখানেই তো ছিল আমার বাপের বাড়ি। সেই গোটা গ্রামটাই কিনে নিলো কারা যেন। তখনই আমার বিয়ে হ'লো। গ্রামটাই বিক্রি করে দিলো জমিদার— কারখানা হবে বলে—ভাসা ভাসা মনে পড়ে ক-ঘরই বা মানুষ ছিল। শুধুই তো জঙ্গল আর পুকুর আর মাঠ। বর্ষায় যখন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি তখন পুকুর থেকে কইমাছের ঝাঁক কান বেয়ে বেয়ে উঠে আসতো মাঠে। বাবা মাথায় গামছা বেঁধে মাছ ধরতে যেতো। মা ব্যাজার হতো, বলতো— এই এতো মাছ এনে ফেলবে, কে কুটবে কে ভাজবে!

স্মৃতিচারণ শুরু হলে মা আর থামতে পারে না। সময় সব কর্জ নিয়ে নিয়েছে, আর ফেরৎ দেবেনা। এখন শুধু স্মৃতি...এবং এভাবে একদিন—

একমাত্র সার্থক কাজ যদি তুমি সময়কে বেঁধে রাখতে পারো। এই যে সৃষ্টি—যা কিছু বাঁধা আছে বইয়ের পাতায়— আমি যখন গ্রহণ করি— চুঁইয়ে পড়ে সুখ অথবা দুঃখ, আনন্দ কিংবা যন্ত্রণা, আমি তখন সেই সময়ে পৌঁছে যাই— সেই বিগত সময়ে যখন লেখক নিজে খুঁড়েছিল নিজেরই হৃদপিণ্ড— এবং এভাবেই একজন স্রষ্টা হারিয়ে দেয় জালিয়াত সময়কে।

নেবেইতো, সব নেবে, আমার সামান্য সাধ্য নেই তাকে আটকাই। তবু আমি চেষ্টা করে যাই। পারি বা না পারি তবু।

আজ সকালে মনটা যখন খুবই ভালো, ভাবছিলাম লেখাটা শুরু করবো ঠিক তখন এলো গোলগাল লোকটি, বলে কিনা কে যেন ওঁকে বলেছে আমার কাছে আসতে যদি আমি ওঁর মেয়েকে ইংরাজিটা পড়াই। অবশ্যই আমার টাকার প্রয়োজন আছে। খুবই প্রয়োজন। কিন্তু চিন্তা করো— শ-দুয়েক টাকার জন্য সপ্তাহে দু'দুটো দিন সন্ধ্যা তোমার গলায় বকলশ বাঁধা। তাছাড়া শুধু একটা কেন, ট্যুইশনি করলে তুমিতো আরও কয়েকটাই যোগাড় করে নিতে পারো। সকালে সন্ধ্যায় রাত্রে সারাক্ষণ গলায় বকলশ পরতে পারো। কোনদিন সন্ধ্যায় যদি তোমার ইচ্ছা হয় ফেরীঘাটে কিছুক্ষণ বসে থাকার সে ইচ্ছাকে গলায়

বকলশ পরিয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে। যদি কোন সকালে তোমার ইচ্ছা হয় ‘হুইটম্যান’ পড়বার তোমাকে শেক্সপীয়ার পড়তে হবে, এবং শুধু পড়া নয়, যে কথন নাড়া দেয় অনুভবে সেগুলি কথার কচকচানিতে ঢুকিয়ে দিতে হবে অপরের মগজে— কি কদর্য্য ব্যাপার স্যাপার!

Fair is foul and foul is fair :
Hover through the fog and filthy air.

নগ্ন দেহে হেঁটে যাই কোনও কোনও সময় স্বপ্নের মধ্যে...মনে হয় কাকে যে খুঁজতে বেরিয়েছি ...ভাবতে ভাবতে পেরিয়ে যাই জনপদ...দুইপাশে চুপিসাড়ে জেগে ওঠে বনভূমি...পায়ের নীচে কখনও ঘাস কখনও মাটি...কিছু কিছু শব্দ শুনি পাখীদের...কিছু কিছু শব্দ শুনি ঝরণার...দেখি তুমি অরণ্য নির্জনে সবুজ ছায়ায় পবিত্র পুষ্পের মতো ফুটে আছো...।

আমি বুঝতে পারিনা দিন কিংবা রাত্রি। কিন্তু এক সবুজাভ আলো ছড়িয়ে থাকে তোমার ফেরানো মুখের একপাশে, বাহুতে, গ্রীবায়, স্তনে, উরুস্তম্ভে। নগ্ন তুমি সবুজ আলো মেখে স্থির বসে থাকো অপরূপ।

কিন্তু স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়ে যায়। আমি তোমার কাছে যেতে পারিনা, তোমাকে স্পর্শ করতে পারি না, তোমাকে চিনতে পারি না। যদিও এক আশ্চর্য তৃপ্তিতে ভরে থাকে শরীর ও মন। আমি সেই তৃপ্তি নিয়ে শান্ত শুয়ে থাকি। বড়ো ভালো লাগে।

পথেঘাটে বিভিন্ন সমাবেশে যেখানেই যাই না কেন, আমি প্রতিটি মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে খুঁজে পেতে চেষ্টা করি স্বপ্নে দেখা তোমার মুখের আদল, কিন্তু পাই না।

এভাবে দিনে দিনে বিষণ্ণতা গ্রাস করছে সমস্ত ভুবন, আমাকে ক্লান্ত করছে। এভাবে ক্লান্ত আমি আজ সন্ধ্যায় বাইরের ঘরে চুপচাপ বসেছিলাম। বুকের মধ্যে কিছু ঘুর্ণী বাতাস জমা করে তুলছিল ঘাস পাতা খড়কুটো ইত্যাদির মতো কিছু শব্দ। ক্রমশঃ সেই শব্দগুলি কবিতার পংক্তি হতে চাইছিল— নগ্ন দেহে হেঁটে যাই কোনো কোনো সময় স্বপ্নমধ্যে...

ভাবছিলাম লিখি। কিন্তু লিখি লিখি করেও ওঠা হচ্ছিল না। খাতা ও কলম নেব— এই নেব— এরকম ইচ্ছার মাঝে হঠাৎ ঝুমঝুম নূপুরের শব্দ। আমি চমকে উঠলাম— ভুল শুনছি নাতো? আমার এই নির্জন পুরীতে—

সহসা বাঁশির সুর ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে, ছন্দবদ্ধ সেই সুরের তালে এবার নূপুরের শব্দ আরও উচ্ছ্বল। আমি অবাক হয়ে গেলাম। ওইতো আমারই বাড়ির একতলার ওই দক্ষিণ প্রান্তের কোনো ঘর থেকে ছড়িয়ে পড়ছে বাঁশি ও নূপুরের ঐক্যতান। মধুর সে সুর উতল করে তুলছে বাতাস, নাকি ঝরিয়ে দিচ্ছে এ বাড়ির বহুদিনের জমাট নৈঃশব্দ্য। আমার মনে হলো যেমন পুরোনো দেওয়াল থেকে তীব্র বাতাসে ঝরে যায় জীর্ণ পলেস্তারা সেরকম ঝরে যাচ্ছে স্তব্ধতা যা দীর্ঘদিন ধরে আঁকড়ে ছিল এ বাড়ির সর্ব অঙ্গ।

নির্জনতা নৈঃশব্দ্য নিঃসঙ্গতা অনেকদিন ধরেই এবাড়ির স্থায়ী সঙ্গী। বস্তুতঃ এগুলিতে আমি ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠছিলাম। এগুলি আমার প্রিয় হয়ে উঠছিল। এগুলিকে আমি ভালবাসছিলাম।

দিদি ও বোনের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর এমনিতেই বাড়িটা খালি খালি লাগত, তারপর বাবা যখন মারা গেলেন তখন সব শূন্য। বাবা একাই ছিলেন একশো।

অবশ্য নিঃসঙ্গ অর্থে বেশিরভাগ মানুষ যেরকম বোঝে সে অর্থে না নিলে আমি মোটেই নিঃসঙ্গ নই। ওই যে বিশাল নিমগাছ— সে যদি একটি হলদে পাতা পাঠিয়ে দেয় হাওয়ায় ভাসিয়ে আমি সেই ভালবাসার উপহার নিয়ে ভরে উঠি। কিংবা এই যে বটের চারা পাঁচিলের ওপর যে একটু একটু করে বেড়ে উঠছে আমার চোখের সামনে, সে যখন রোদ্দুর মেখে বাতাসে দোল খায় আমি তখন তার সঙ্গসুখে তৃপ্ত হই। পড়ন্ত বিকালে ফেরীঘাটে চুপচাপ বসে দেখি জলের ওপর ছোট ছোট হাজার সাথীর হাতছানি—শুনি ছলাৎছল কথা বলা। মধ্যরাত্রে নিদ্রাহীন কখনও শুনি বাতাসের আলাপ...

কিন্তু আজকের সন্ধ্যার ঘটনা সম্পূর্ণ অন্য, আজ আমারই বাড়ির কোথায় ছড়িয়ে পড়ছে নতুন সুরলহরী, ভেঙে দিচ্ছে—

আমি উঠলাম, ভিতরে এলাম, বারান্দায় দাঁড়ালাম। পূর্বের এই দীর্ঘ বারান্দা যেখানে দক্ষিণে বাঁক নিয়েছে বাঁকের কাছাকাছি এসে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। বাঁশি ও নূপুর এখন আরও চঞ্চল আরও উচ্ছল। কান পেতে শুনলাম সম্ভবতঃ পায়ের আঘাতের শব্দ। নৃত্যরত কোন পদযুগলের আঘাতে মেঝেতে শব্দ উঠছে।

দক্ষিণের শেষ ঘরের দরজা খোলা। খোলা দরজা দিয়ে আলোর আয়তক্ষেত্র শান্ত শুয়ে আছে বারান্দায়। ওখানে আলোর গণ্ডীতে গিয়ে দাঁড়ালে আমি নিশ্চয় কোন আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পাবো।

বাঁশির সুর হয়ে উঠেছে আরও মধুময়... কী গভীর আকুলতায় সে সুর জড়িয়ে ধরতে চাইছে ছন্দময় দুটি চরণ...মুগ্ধ আমি পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালাম আলোর সীমানায়।

তার দুই হাত বুকের কাছে, আঙুলগুলি প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো মেলে আছে— এরকম ভঙ্গীমায় স্থির হ'য়ে গেল সে, থেমে গেল চঞ্চল চরণ।

...নিঃশব্দে ভেঙে যায় দীর্ঘস্তম্ভ গম্বুজ খিলান— ধরণী বিভক্ত হয়ে উঠে আসে জলস্তম্ভ

— সবুজ জলের স্রোতে ডুবে যায় শরীর ও উদ্যান...বৃক্ষেরা শিকড় ছেঁড়ে— ভেসে যাবে সবুজ প্লাবনে...অনাদি অনন্ত এক সমুদ্র সবুজ শুধু...আমি ভেসে যাই।...

...তুমি কি এলে? স্বপ্ন থেকে নেমে এলে? তোমার মুখের আদলে ও কার ছায়া?

স্বাভাবিক দাঁড়ায় সে। দু'হাত নামিয়ে আসে, অবাক দু'চোখ তুলে ছোট্ট প্রশ্ন করে—কে?

ততক্ষণে স্বাভাবিক আমি দেখতে পাই আসবাব সাজানো ঘর, নীচু এক শো কেসের

ওপর ওটা কি? সম্ভবতঃ টেপ রেকর্ডার— বাজছে বাঁশির সুর— সব কিছু আমার কাছে সহজ হয়ে যায়।

কদিন ধরে মা বলছিল নীচে ওই বসার ঘরটা বাদ দিয়ে বাকিগুলো ভাড়া দিয়ে দেবো ভাবছি। যদিও জানি বাড়ি ভাড়ার টাকা পেলে তুই আরও কুড়ে হয়ে যাবি, তবু উপায় কি? কলসীর জল গড়িয়ে খেলে কদিন চলে? তাছাড়া ঘরগুলোও বন্ধ পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে, মানুষ থাকলে ব্যবহারে ভালো থাকবে।

ইতিমধ্যে কবেই যে মা ঘরগুলি পরিষ্কার করালো আর কবেই যে ভাড়াটিয়া ঠিক করলো—

এইসব দ্রুত চিন্তাধারায় কয়েক মুহূর্ত কেটে যায় তারপর আমি তার প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করি, খুবই অস্বস্তির সঙ্গে বলি— এটা আমাদের বাড়ি, আমি জানতাম না— কথা শেষ করতে পারিনা, কি বলব? জানতাম না ভাড়া দেওয়া হয়েছে?

—ও! ভেতরে আসুন না, —দ্বিধাহীন বলল সে।

তার পরণে বাসন্তী রঙের তাঁতের শাড়ী, গায়ের রঙ প্রায় শাড়ীর মতো, প্রসাধনহীন লাবণ্যময় মুখে মুক্তার মতো জমেছে ঘাম নাচের শ্রমে, কোমরে জড়ানো আঁচল খুলে মুখ মুছতে মুছতে আবার ডাকল—আসুন!

আমি এলাম, কুণ্ঠিত পায়ে ঘরের ভেতর এলাম।

শো কেশের পাশে একটি চেয়ার ইঙ্গিতে দেখাল সে, আমি বসলাম।

মেঝেয় পা মুড়ে ব'সে নূপুর খুলতে খুলতে সে বলল, বাবা মা গেছেন আগে আমরা যেখানে থাকতাম সে বাড়িতে, ভাইও সঙ্গে গেল, পুরোনো বন্ধুদের ছেড়ে এসেছে তো! আমি একা কি করি, তাই একটু—

নূপুর খোলা হয়ে গিয়েছিল, সেগুলি হাতে নিয়ে বিছানায় বসল সে, বলল— একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু।

— আমার এভাবে আসা উচিত হয়নি— অপরাধীর মত বললাম আমি, তার মুখের দিকে তাকালাম, আবারও বুকের মধ্যে সামুদ্রিক আলোড়ন। এ এক নতুন অনুভব, আগে কখনও কোন মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার এরকম হয়নি। যদিও আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না এ মুখের সঙ্গে স্বপ্নের সেই মেয়ের কোন মিল আছে কি নেই।

স্বপ্নে যে আশ্চর্য তৃপ্তিতে ভরে যায় দেহ মন, এখন তেমন কোন অনুভবও আমার মধ্যে নেই। এ এক উত্তাপময় কিছু, আমি অস্থির হয়ে উঠলাম।

বাইরে তীব্র হয়ে উঠেছে বাতাস, জানালার পাল্লাগুলির ছটফট করে উঠল। —ঝড় উঠল কি? আমি বললাম, —বলতে বলতে পালিয়ে এলাম।

এখন অনেক রাত। ঘুম নেই। তার ছন্দময় স্থির মুদ্রা সুচারু বসার ভঙ্গী বঙ্কিম গ্রীবা নিবিড় ওষ্ঠ দীর্ঘ আঁখিপল্লব ভ্রূভঙ্গী কপালের পাশে দু'একটি চুলের ওড়াউড়ি কপালে বিন্দু

বিন্দু ঘাম— সব সবকিছু আমার বন্ধ চোখে ভাসে।

বৃক্ষলতা তৃণগুল্ম ফুলপাখী আকাশ রোদ্দুর সবকিছু যেভাবে আমার, তার সাথে যুক্ত হবে যে মানবী সে কি এই?

তুমি কি ঘুমিয়ে এখন? কোমল ভঙ্গিমায় শিথিল বেশবাসে এলায়িত চুলের রাশিতে?

আমি ঘুম হারা।

এই বাসভূমি— এই বিস্তৃত প্রাঙ্গণে প্রকৃতি পরম যত্নে ছড়িয়ে দেয় স্বর্ণ শষ্যকণা, আমি তো পাখীর ঠোঁটে খুঁটে খুঁটে তুলে নিই, আমার সঞ্চয় বেড়ে যায়...

এভাবেই যায় দিন, এভাবেই প্রতিদিন যায়...

এই রোদ এই মেঘ এই বৃষ্টি এ বাতাস মেখে নেয় বনস্থলী, বেড়ে ওঠে পরম সবুজে পর্বত শিখর থেকে জমাট তুষার দ্রব হয়, নদীর শরীর ভরে যায়...

এভাবেই যায় দিন, এভাবেই প্রতিদিন যায়...

এভাবেই আমি ছিলাম। কিছু স্বপ্ন কিছু কল্পনা কিছু দুঃখবোধ এই সব মিলেমিশে একাকার সবুজ সরোবরে আমার বাস। কিন্তু ইদানিং এক অচেনা উষ্ণ স্রোতধারায় আমি অসহায় ভেসে যাচ্ছি। বনশ্রী সামনে এলে মনে হয় সেই স্রোত আরও বেগবতী এবং আমি আরও দ্রুত ধাবমান কোথায় কোথায়। যখন দূর থেকে শুনি শুধুমাত্র কণ্ঠস্বর, বুকের মধ্যে রক্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

নীচের এই ঘর থেকে আরও বেশি শোনা যায় তার কলকাকলি। কখন হয়তো উঠোনে দাঁড়িয়ে কাপড় মেলতে মেলতে মায়ের সাথে কথা বলছে, কখন হয়তো ভাইকে বকছে।

মা বলছিল নীচের ঘরটা খালি করে সব ওপরে নিয়ে আয়, তাহলে ওই ঘর দুটোও দিয়ে দিই।

কিন্তু আমার মন একেবারেই সায় দেয় না। এ ঘরে বনশ্রী যত সহজে আসে, বই নেয়, গল্প করে, আমি ওপরে চলে গেলে—

একতলার এই কোণের ঘর এটা আমাদের বৈঠকখানা। এই ঘরের পাশ দিয়েই উঠে গেছে ওপরে যাবার সিঁড়ি। যদিও ওপরেই আমাদের সব কিছু ব্যবস্থা তবু দিন ও রাত্রির অনেকটা সময় আমার নীচের এই ঘরেই কেটে যায়। এই ঘর আমার সুখের ঘর, আমার স্বপ্নের ঘর।

বৃহদায়তন এই ঘরের চার দেওয়াল জুড়ে শুধু বই আর বই। বাবার পড়ার শখ ছিল যেমন কেনার শখও ছিল তেমন। আমার পার্থিব সম্পদের মধ্যে আছে এই অমূল্য সংগ্রহ, এই বাড়ি, আর কিছু অর্থ। এ সবই বাবা রেখে গেছেন। এই সবই আমার যথেষ্ট। এর বেশি আর কি চাই? তবুতো আমি এইসব নিরাপত্তা নিয়ে নিশ্চিত জীবন যাপন করি। এই সব বাদ দিয়ে সে রকম সুখী মানুষ কি আমি হতে পারবো— বনভূমে সেইসব মানুষেরা

যারা গান গেয়ে গেয়ে ঘরে ফেরে পাতার কুটিরে সন্ধ্যাকালে— কিংবা ফুটপাথের শিশু যে হাইড্র্যান্টের জলে মহানন্দে স্নান সেরে ফুটপাতে বসে মুখে তুলে নেয় ভিক্ষালব্ধ অন্ন?

সুখ দুঃখ স্বপ্ন সাধের এই ঘরটি আমার কাজের ঘরও বটে। অবশ্য এটা শুধু আমিই জানি মনে মনে। আমার মা শুনলে হেসেই অস্থির হবে— বাউণ্ডুলে কুড়ের আবার কাজের ঘর!

মা, আমি গড়তে পারবো না ইমারৎ কিংবা সেতু, কিন্তু মা আমিও কাজ করি। সে কাজের পরিশ্রম যে কোন কাজের চেয়ে অনেক বেশি। নিজেরই বুকের মধ্যে নিজ হাতে চলে খনন, রক্তাক্ত হতে হয়। হয়তো একদিন এই সৃষ্টি থেকে কেউ পাবে দুঃখ বা আরোগ্য, কিংবা নাই যদি আসে সার্থকতা—

থাক, এসব চিন্তা থাক, জালিয়াত সময় সারাক্ষণ মুখিয়ে আছে শোষণ করে নিতে, অলক্ষ্যে বহে যায় প্রাণপ্রিয় নদী, এভাবেই একদিন সময় তোমাকে জীর্ণ ফেলে দেবে—

—কে দাঁড়িয়ে ওখানে? ভেতরে আসুন।

চিন্তার গভীরে ডুবে গেলে পারিপার্শ্বিক সবকিছু কেমন অদৃশ্য হয়ে যায়। শুধু কেমন এক তরল অন্ধকার চারিদিকে ভেসে থাকে। ও কতক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে? হঠাৎ হাওয়ায় আঁচল উড়ল— আমি টের পেলাম...।

—ওভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে? ডাকেন নি কেন? বললাম আমি।

—দেখলাম আপনি গভীর মনোযোগে কি যেন লিখছেন— বলল সে, অল্প হাসল—আমি কিন্তু জেনেছি আপনি কবিতা লেখেন— বলতে বলতে এগিয়ে এসে চেয়ারে বসল।

—কি আশ্চর্য্য! কে বলল?

—আমি জানি— মাথা হেলিয়ে অপরূপ ভঙ্গীতে বলল সে—

পলিমাটি বহে আনো, নিজেই নিজের বুকে গড়ে তোল চর
হে আমার নদী—

কি? ঠিক বলেছি কিনা? আপনার কবিতার পংক্তি?

কি বিস্ময়...এমন করে আমার কবিতা আমি কখনও কারও মুখে শুনিনি! কেমন শিহরণ লাগে...অর্থ যেন গভীরে কোথাও লুকিয়েছিল মনে হয়...এমন গভীর করে আমি কি কিছু বলতে চেয়েছিলাম এই কবিতায়?

খুব অবাক হয়ে গেছেন তো? আসল ব্যাপার আজ দুপুরে ডাক পিওন অনেকক্ষণ ধরে কড়া নাড়ছিল। আপনি নেই , মাসীমাও বোধহয় ওপর থেকে শুনতে পাননি, যাই হোক আমি দরজা খুললাম, ডাকপিওন একটি পত্রিকা দিলো। পত্রিকা হাতে নিলে একটু পড়ে দেখতে ইচ্ছে যায়, পড়তে গিয়ে দেখি আপনার একটি লেখা।

—আপনি কবিতা পড়েন?

হাতের কাছে পেলে পড়ি, তবে সব বুঝিনা। অবশ্য আপনার এই লেখা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। আচ্ছা, আপনি কি এরকম কিছু বলতে চেয়েছেন— আমরা নিজেরাই নিজেদের জীবনে জড়ো করে তুলি পলিমাটির মতো— ঠিক কি বলবো দুঃখ কষ্ট এই সব যেগুলি রুদ্ধ করে দেয় আমাদের জীবনস্রোত?

কি উত্তর দেবো আমি? কিছুই বলতে পারিনা।

—খুব বোকার মতো কিছু বললাম বোধহয়— অপ্রস্তুত গলায় বলল সে।

—না না, আমি অস্থির— ওরকম বলবেন না, আমি নিজেও অমন ভাবে ভাবিনি।

তাহলে? —সাগ্রহে মুখ তুলে চায় বনশ্রী।

—এ কবিতা আমি লিখেছিলাম একটি নদীকে দেখে, বললাম আমি। —আমার পিসিমার বাড়ি যেতে একটি নদী পার হতে হয়। শুধুই বালির চর, কোথাও কোথাও সামান্য জল আছে, আর আছে শর বন। সারাদিন হাওয়ায় ওড়ে বালি, সন্‌সন্‌ শব্দ হয় যেন অস্ফুট সংলাপ। এভাবে নদী পেরিয়ে গেলে তীর ছুঁয়ে কাত হয়ে পড়ে আছে এক জীর্ণ নৌকা, তার খোলে জমা হয়ে আছে একরাশ বালি। বর্ষায় যখন নদী জলে ভরে ওঠে তখন নৌকা জলে ভাসে, লোক পারাপার হয়।

এত বলে আমি থামলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, ঘরে আবছা অন্ধকার। বনশ্রীর মুখ ঈষৎ ঝাপসা, ওর মুখের অভিব্যক্তি বুঝতে চেষ্টা করলাম আমি।

—এই নদীর সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। মাঝে মাঝে আমি পিসিমার বাড়ি যাই, দু'চারটে দিন কাটিয়ে আসি। যে কদিন থাকি রোজই নদীর সাথে আমার কথা হয়। ওই কাত হয়ে পড়ে থাকা নৌকার কাছাকাছি ওখানে পাড়ে বসেই কথা সাজিয়েছিলাম। আর একবার বলবেন? যতটুকু মনে আছে ততটুকু।

একটুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল, অন্ধকার আরও ঘন হয়ে উঠেছে, বনশ্রীর মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না আমি। সহসা কেমন এক মায়াময় উদাস কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়ল ঘরে...

পলিমাটি বহে আনো, নিজেই বুকে গড়ে তোল চর
হে আমার নদী, হে আমার সাবলীল স্রোতঃশীলা নদী
স্বেচ্ছারুদ্ধ পড়ে আছো, অনাবিল দেহে জমে শ্যাওলার স্তর
শরবন বেড়ে ওঠে সন্তর্পণে শুষে নেয় জীবন জলধি।

একটু থামল বনশ্রী। আমার বুকের মধ্যে কম্পন। কি গভীর স্তব্ধতা সমস্ত ঘরে, অথচ অনুরণন।

পাশ ফিরে শুয়ে আছে জীর্ণ নৌকা কতকাল বালুচরে একা।
পারানিয়া কেউ নেই, কত দীর্ঘকাল নেই মাঝিয়ার দেখা।
বাতাস শিশুরা শুধু খেলা করে সারাবেলা ওড়ায় সোনার মত বালি।
অবোধ অস্ফুট সুরে গান গায় অবিরাম, বাজায় আনন্দ করতালি।

আমি কি মৃত্যুর দিকে চলে যাচ্ছি? সুখ না দুঃখ কোন অনুভব আমার বুকের মধ্যে? তুমি কি নদীর ওপারে দাঁড়িয়ে? বনশ্রী?

চুপচাপ কতক্ষণ কেটে গেছে, এক সময় বনশ্রী বলল— আলোটা জ্বালিয়ে দিন।

আমি উঠলাম, 'সুইচ অন্' করলাম, ঘর আলোয় ভরে গেল।

—নিজের লেখা কখনও অপরের মুখে আমি এমন করে শুনিনি— সম্মোহিত আমি বললাম।

—ভালো লাগলে কবিতা আমার তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয়ে যায়— বনশ্রী বলল— আপনাকে শোনাবো বলে আরেকটু ভাল করে তৈরি করে নিয়েছি। আপনার ভাল লেগেছে?

আমি কোন কথা বললাম না, মুগ্ধ দৃষ্টি শুধু তুলে ধরলাম।

বনশ্রী মুখ নীচু করে নিল— আমি আসছি, অস্ফুট গলায় বলল সে, যে বইটা নিয়েছিলাম রেখে যাচ্ছি, পত্রিকাটা কাল দেবো।

কোলে বইটা নিয়ে বসেছিল ও, হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, পশ্চিমের আলমারির কাছে এগিয়ে গেল, বইটা তুলে রাখতে রাখতে—বলল এ্যাতো বই, কিন্তু বড়ো অযত্নে রয়েছে, আলমারি বন্ধ করে হাতের ধূলো ঝাড়ল, বলল— যদি অনুমতি দেন আমি এগুলোর একটু যত্ন নিতে পারি।

আমি তার মুখের দিকে অপলক চেয়েই ছিলাম, বললাম অনুমতির কোন প্রয়োজন আছে?

বনশ্রী চলে গেছে। এখন এই ঘরে সেই আশ্চর্য সুবাস ভেসে আছে যে সুবাস বনশ্রীর শরীরে। এখন এই ঘরে ভেসে আছে তার কণ্ঠের অনুরণন। পৃথিবীতে কোন শব্দই নাকি বিনষ্ট হয় না, রয়ে যায় বাতাসে— কথাটার অর্থ আমার কাছে এতদিন পরিষ্কার ছিল না, কিন্তু এখন এই মুহূর্তে আমি অনুভব করতে পারছিলাম...

যখন আমি এক প্রকার অসুস্থতার শিকার হই— অর্থাৎ সকালে ঘুম ভেঙে মনে হয় নুনের আরকে থাকে সারারাত সমস্ত শরীর— নিজেকে তখন খুব ক্লান্ত মনে হয়, মনে হয় নিদ্রাহীন সারারাত অনেক পরিশ্রমে কেটে গেছে। এক প্রকার তিক্ততা, কিছু ভালো লাগে না। এরকম সময়ে আমি বুঝতে পারি আমার নদী ও বৃক্ষের রাজ্যে কয়েকদিন নিঃশ্বাস

নেওয়ার প্রয়োজন।

এই শহর...এই অশ্লীল শব্দের শহর...এই দেওয়াল ও নর্দমার শহর...পাঁচিল থেকে পাঁচিল...দেওয়াল থেকে দেওয়াল...সমস্ত শরীরে আমার দাঁতাল দেওয়াল ঢুকে যায় আর অসংখ্য নর্দমা...নর্দমা থেকে নর্দমার শাখাপ্রশাখা সুড়ঙ্গ কেটে ঢুকে যায় শরীরে, শিরা ও ধমনীতে রক্ত নেই, শুধু পচা জল।

মধ্যরাত্রে নিদ্রাহীন শুনি মৃত সব বৃক্ষদের দীর্ঘশ্বাসের শব্দ...এই শহর একদা ছিল বৃক্ষলতাগুল্ম বেষ্টিত সবুজ রাজ্য...এখন এই শহরের বুকে মধ্য রাত্রে বাজে তাদের দীর্ঘশ্বাস।

মাঝে মাঝে আমি এই প্রকার অসুস্থতার শিকার হই, তখন বেরিয়ে পড়তেই হয়।

যদিও অর্থনৈতিক অবস্থা আমার অন্তরায় তবু যেভাবে হোক কুলিয়ে নিতেই হয়। না হলে মনে হয় এখানে নিঃশ্বাস নিলে আমি বাঁচবো না।

ঠিক এখন আমি তেমনই অসুস্থ। বেশ কিছুদিন ধরেই প্রত্যহ সকালে আমি অনুভব করছি যন্ত্রণা অথচ বেরিয়ে পড়া হচ্ছে না।

কখনও কখনও গতিময় রেলগাড়িতে বসে দেখেছি পাশে এসে গেছে আরেকটি গাড়ি, তারপর দুই রেলগাড়ির পাশাপাশি ছুট-কে কাকে হারায়। আমার এই অস্থিরতা যা আমাকে ঘরছুট করায় ইদানিং তার পাশাপাশি ছুটে যাচ্ছে আরও এক—

গতরাত নিদ্রাহীন। মাঝে মাঝে যতবার তন্দ্রা এসেছিল আমি বুকে হেঁটে ঢুকে যাই মৃত্তিকা অভ্যন্তরে, বিশাল নর্দমার ভিতর পচা জল নাকে মুখে...কুৎসিত ব্যাঙেরা বিকট লাফিয়ে ওঠে গায়ে....আমি পালাতে চাই— পারিনা, এভাবে তন্দ্রা ছুটে যায়। সমস্ত শরীরে গ্লানি। মাথার ভেতর মাকু ছোটাছুটি করে খটাখট শব্দ তুলে তাঁতে বুনে চলে যন্ত্রণা।

সকালে উঠে কি ক্লান্তি কি ক্লান্তি! সাত সকালে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলাম সামান্য শুচিতা, পাখা চালিয়ে শুয়ে রইলাম। মা ছিল পুজোর ঘরে, দেখেনি, দেখলে বকাবকি চলত! ভিজে মাথা বাতাসে সামান্য যন্ত্রণামুক্তির দিকে, ভাবলাম আজই বেরিয়ে পড়তে হবে। মা যখন চা দিতে এলো মাকে বললাম—কদিন পিসীমার বাড়ি ঘুরে আসবো ভাবছি।

কিন্তু

দুপুরে খাওয়ার সময় মা বললো—আজ রাতে তোর নেমন্তন্ন।

—আমার নিমন্ত্রণ? কোথায়?

—নীচে বনশ্রীদের ওখানে।

কেন, কি বৃত্তান্ত, এসব কিছুই আমি জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না আমার খাওয়ার ব্যাঘাত ঘটছিল, আমি অস্থির বোধ করছিলাম।

দুপুরে ন্যাশনাল লাইব্রেরী গেলাম। প্রাচীন বাংলা পত্রপত্রিকা নিয়ে কিছুদিন ধরে ঘাঁটাঘাটি করছিলাম, আজ একপাতাও পড়া হলো না। বিকালে যখন বেরুলাম দেখলাম

শুধুমাত্র পুরোনো কাগজের সোঁদা গন্ধ ছাড়া মস্তিকে আর কিছু নেই। ভেবে দেখলাম সারাদিন আমি শুধু সন্ধ্যারাত্রির দৃশ্য পরিকল্পনা করেছি মনে মনে— কখন যাবো, কিভাবে ডাকবো, কি কথা হবে, খেতে বসা, পরিবেশন—

সব সময়ই আমি দেখেছি ভাবনার দৃশ্য অনুযায়ী কোন কিছুই ঘটে না। আজও তাই। সন্ধ্যাবেলা ঘরে বসে লেখার চেষ্টা করছিলাম এবং ক্রমশ সুস্থির তখন অনুভব করলাম পাশে দাঁড়িয়ে বনশ্রী। এত কাছে আমি একটু নড়লেই ছুঁয়ে যাবে।

—আজ আমাদের বাড়ি নিমন্ত্রণ, মনে আছে তো? বলল সে। মুখ তুলে কয়েক মুহূর্ত্ত আমি চুপচাপ তারপর— বুঝতে পারছিনাতো, কখন আমাকে নিয়ন্ত্রণ করলন?

—বারে, আমি মাসীমাকে সকালে বলে এসেছি! আপনি জানেন, উঁ! ঠাট্টা করছেন!

সামনের চেয়ারে বসল সে— কয়েকদিন ধরে দেখছি আপনি বড় কিছু লিখছেন, পাতার পর পাতা—এ তো কবিতা নয়, কি লিখছেন?

—না কবিতা নয়, এটা— আচ্ছা লেখা শেষ হোক তখন বলব।

—আচ্ছা তাই, এখন চলুন আমাদের ঘরে।

—এখনই?

আজ্ঞে হ্যাঁ, —ঘাড় ঝাঁকালো সে —গেলে লাভই হবে মশায় লোকসান হবে না।

—তাহলে অবশ্যই যেতে হয়— আমি উঠলাম, 'সুইচ অফ', করলাম। দরজা দিয়ে বেরোবার সময় মৃদু স্পর্শ— তরঙ্গের মতো কিছু— বারান্দায় পা দিলাম।

—আজ আপনাকে রবীন্দ্রসংগীতের অনেকগুলি ভালো রেকর্ড শোনাবো— আলতো গলায় বলল বনশ্রী।

তারপর

সেই ঘর। ঘরে ঢুকে নিঃসঙ্কোচে দরজা ভেজিয়ে দিলো সে, বলল— পাশের ঘরে বাবা ভাইকে পড়াচ্ছেন।

'তোমার দ্বারে কেন আসি ভুলেই যে যাই' ...দেবব্রত বিশ্বাসের উদাত্ত কণ্ঠ... মেঝেতে ফুলকাটা জাজিম, গাঢ় লালের মাঝে বড় বড় হলুদ ফুল আর লতাপাতা, পা মুড়ে বসেছে সে, নীচু শো কেশের ধার ঘেঁসে। বিকালের হালকা প্রসাধন মুখে তার, কপালে ছোট্ট টিপ।

ভারী কণ্ঠের সুর ঘর ভরে থাকে। একের পর এক গান বেজে যায়, আমি তন্ময়, মাঝে মাঝে তন্ময়তা ভেঙে চেয়ে ফেলি মুখে— চোখে চোখ— দৃষ্টি সরিয়ে নিই। ঘূর্ণায়মান পাখা ঠাণ্ডা হাওয়া ছড়িয়ে যায়। উঠোনে অন্ধকার। বিশ্ব চরাচরে আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই।

গান শেষ হলো। সে বললো, আরেকটি ভাল রেকর্ড— এবার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়— বলতে বলতে বেজে যাওয়া সি.ডি. খুলল সে পাশ ফিরে শো কেশের পাল্লা সরালো, নীচের তাক থেকে রেকর্ড টানতে গেল, আর তখনি একরাশ ফটো— সম্ভবতঃ সি.ডি.

গুলির ওপর ছিল— ছড়িয়ে পড়ল জাজিমের ওপর।

—এ মা! —ব্যস্ত হাতে ছবিগুলি গোছাতে লাগল সে, মুখ তুলে একটু হাসতে চাইল।

—কার ছবি? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

—আমার ফাংশানের ছবি সব-মৃদু গলায় বলল সে, —এখানে কখন রেখেছি কি জানি!

আমার মন বলল— অভিনয়, ওখানে রেখেছো ওভাবে ছড়িয়ে ফেলার জন্যই, আমাকে দেখানোর জন্য। কি সুখ! —আমি দেখবো! —বলতে না বলতে তার এগিয়ে দেওয়ার ব্যগ্রতা— আমি হাত পেতে ছবিগুলি নিলাম।

খুবই যত্নে একটি একটি করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমি ছবি দেখতে লাগলাম, জিজ্ঞাসা করলাম—এটা কোন ফাংশানের? ওটা কোন নৃত্যনাট্যের? কোন অডিটরিয়ামে এই নৃত্যনাট্য হয়েছিল...

সে নীচু হয়ে ঝুঁকে আমাকে খুব বোঝাচ্ছিল। তার দু'একটি উড়ন্ত চুল আমার মুখ ছুঁতে চাইছিল যেন।

শেষে আমি অস্ফুটে বললাম—কি সুন্দর। আমি বলতে চাইছিলাম— কি সুন্দর তুমি।

ওপাশ থেকে ডাক এলো— খুকু এবার একটু আয়— লুচিগুলো বেলে দে—

—মা ডাকছে— বলল সে, দ্রুত হাতে সি.ডি. লাগাল, গান বেজে উঠল— চরণ ধরিতে দিওগো আমারে...

—আসছি— হাত তুলে মাথা একদিকে হেলিয়ে অপরূপ ভঙ্গীতে বলল সে— বেরিয়ে গেল।

তারপর আমরা খেতে বসলাম— ওর বাবা, ভাই, আমি। বনশ্রী পরিপাটি পরিবেশন করছিল, দরজায় দাঁড়িয়ে ওর মা।

—আরেকটু মাংস নাও না বাবা, — উনি বললেন— না না করছ কেন?

—সত্যি অনেক খেয়েছি, বিশ্বাস করুন— বললাম আমি— মাংস আমার খাওয়াই হয়না, মা আর এসব ঘাঁটতে চাননা, আমিও জোর করিনা।

—হ্যাঁ, দিদি বলছিলেন।

তারপর

বারান্দায়

কেউ নেই

—হাত পাতুন।

আমি হাত পাতলাম। কয়েকটি এলাচের দানা। ওগুলি আমার হাতে রাখবার সময় সে একটুক্ষণ বেশি সময় আঙুলের ডগাগুলি ছুঁইয়ে রাখল আমার তালুতে।

শুনি রাস্তায় ও কে হেঁটে যায়, মাটি চাই মাটি— ও কে? ও কি ফেরিওয়ালা? নগরবাসীকে জিজ্ঞাসা করছে মাটি কিনবে, মাটি? নাকি কোনও মাটির মানুষ যে মাটি হারিয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছে— মাটি চাই মাটি!

—এই শহর, এই আগ্রাসী শহর সব মাটি খেয়ে নেয়...

তবুও এই শহরে কোথাও সামান্য একটু মাটি পেলে জন্ম নেয় কিছু হতভাগ্য গাছ, অলক্ষ্যে বেড়ে ওঠে, রুগ্ন বৃক্ষ হয়, কোনক্রমে টিকে থাকে শ্রীহীন। বাতাসে বিষের ভেজাল, অতঃপর মলিন সামান্য কিছু পাতা ছড়িয়ে বেঁচে থাকে...বর্ষপরিক্রমায় আসে কিছু শীর্ণ মঞ্জরী ...অপুষ্ট দু একটি ফল।

মাটি এখানে বড়ো দরিদ্র, বড়ো দীন।

মাটিকে অস্বীকার করে তবু মাটি আঁকড়ে বেঁচে থাকতে হয়। এই মাটি— এই মাতৃসম মাটি...

আজ মায়ের গলায় বেজেছে এক অনুযোগের সুর? মা বলল— হ্যাঁরে তুই যে পিসীমার বাড়ি যাবি বললি তা চার পাঁচদিন হয়ে গেল, কবে যাবি?

আমার বেরিয়ে পড়ার সময় মাকে এরকমই বলি। যাওয়ার তো কোন ঠিক ঠিকানা নেই তাহলে কি বলব? মা ভাববে। তাই বলি— মা কয়েক দিনের জন্য পিসীমার বাড়ি ঘুরে আসব ভাবছি। অবশ্য ওখানেও কখনও কখনও যাই। এই বোধহয় প্রথম আমি যাবো বলেই বেরিয়ে পড়লাম না। আজ চার পাঁচদিন হয়ে গেল।

—এতদিনে তুই মনে হচ্ছে টানে পড়েছিল— মা বলল।

দুপুরে জানালার ধারে বসে কি যেন একটা সেলাই করছিল মা। এলো চুল পিঠে ছড়ানো। মায়ের চুল সবই প্রায় সাদা হয়ে এলো। —ভাবছিলাম আমি— তখনই মা কথাটা বলল।

আমি মায়ের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না, তবু কথার মধ্যে ছিল কেমন একটা অভিমানের সুর, আমি বুঝতে পারলাম। মনে হলো মা যেটা বলল না তা এই— মায়ের প্রতি আমার টান নেই, পিছুটান যে দিতে পারল সে—

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে কোনাকুনি একটু আকাশ দেখা যায়, আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি আস্তে আস্তে বললাম— মা, তুমি হচ্ছ মাটি, আমি গাছ, এর চেয়ে বড় টান আর কি হতে পারে?

মা চমকে উঠল, আমার দিকে ফিরে বসল, আমার মুখের দিকে একটুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে বলল— জানিরে জানি, তবু এ মাটিতো চিরকাল থাকবে না রে! তুই কারো টানে বাঁধা পড় আমি মনে প্রাণে চাই, কতকাল এমন বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরবি।

একথার উত্তরে আমি শুধুই খুব হাসলাম। — হেসে উড়িয়ে দেওয়ার কি আছে? বনশ্রী মেয়েটি তো দেখতে শুনতে ভালই, গুণও অনেক— কথাটা বলে মা আমার মুখের

দিকে তাকিয়ে রইল।

—আচ্ছা মা তুমি বোধ হয় ওনাদের কাছে গল্প করেছ— আমার খাওয়া দাওয়া ইচ্ছা মতো হয় না— এইসব?

—হ্যাঁ করেছি তো!

—সেজন্যই সেদিন আমার নিমন্ত্রণ হলো?

—তা কেন? মা হেসে ফেলল।

—হ্যাঁ তাই— জোর দিয়ে বললাম আমি।

—কেন, তোর কি খারাপ লেগেছে?

আমি কোন উত্তর দিলাম না, ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

...বারান্দায় থৈ থৈ ফুল...উঠোনে ফুল থৈ থৈ...ফুলেরা বাতাসে দোলে... আকাশে ফুলের মেঘ... ফুলবনে সিঁড়ি বেয়ে আমি নীচে নামি...ঘর ফুলে ভরে আছে...

আজ এক আশ্চর্য সুখময় দিন।

আজ সকালে আমি যখন লিখছিলাম বনশ্রী ঘরে এলো, একটা আলমারি খুলে বইপত্র মেঝেতে নামাতে আরম্ভ করল। আমি কলম থামিয়ে ওকে একটু দেখলাম তারপর আবার লেখায় মন দিলাম।

—আমি জানতে চেয়েছিলাম পাতার পর পাতা ওটা কি লেখা হচ্ছে— একটা বই থেকে ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল সে— কিন্তু উত্তর পাইনি, বলতে আপত্তি আছে?

এই প্রথম তাকে আমার উপস্থিতিতে আলমারি ঝাড়ামোছা করতে দেখলাম। ঘরের কয়েকটি আলমারি ঝকঝকে হয়ে উঠেছে দেখেছিলাম, কিন্তু সেগুলি হয়েছে আমার অনুপস্থিতিতেই।

—লেখা তো টেবিলে পড়েই থাকে, পড়ে দেখলেই হয়।

—কেন পড়ব? বিনা অনুমতিতে লুকিয়ে লুকিয়ে? বয়ে গেছে! আমি কি চোর?

—এতদিন জানতান চোর আসে মূল্যবান জিনিস চুরি করতে, এরপর জানলাম লেখা পড়ে দেখাও চোরের চুরির মধ্যে পড়ে— বললাম আমি, কলম বন্ধ করলাম, গুছিয়ে বসলাম।

—লেখার অসুবিধে হলে আমি চলে যাচ্ছি— আলমারি বন্ধ করতে করতে বলল সে।

—লেখা কিছুই হচ্ছে না, আমি কাটাকুটি করছিলাম— বললাম আমি— কৌতূহল নিবৃত্ত করি, এটা একটা গল্পের প্রচেষ্টা।

—তাই নাকি? তাহলে তো পড়তেই হবে।

—বোধ হয় ভাল লাগবে না।

—কেন?

—কেন জানিনা, তবে মনে হচ্ছে। আসলে লেখাটা ঠিক নিয়ম মাফিক নায়ক নায়িকা

ইত্যাদি নিয়ে লেখা নয়। এটা এক বৃদ্ধ ও একটি গাছের গল্প। বৃদ্ধ যেখানে বাড়ি করেছেন সেখানে ওই বিশাল বৃক্ষ একদা মহীয়ান ছিল, এখন সেই মৃত বৃক্ষ বৃদ্ধকে প্রতিনিয়ত যন্ত্রণা দেয় ঘুমে জাগরণে, বাল্যকাল থেকে তিনি গাছপালা বড়ো ভালবাসতেন।

দু'জনে কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপর—

—ভাল লাগবে কিনা সে আমি পড়ে দেখবো মশাই, এখন আমার একটা অনুরোধ শুনুন, —টেবিলের কাছে এগিয়ে এলো সে, দু'হাতে ভর দিয়ে দাঁড়ালো।

—বলুন—আমি সাগ্রহে মুখ তুলে তাকালাম।

সে মুখ নীচু করে নিলো, তারপর আস্তে আস্তে বলল— আজ সন্ধ্যায় আমার একটি নাচের অনুষ্ঠান আছে, আপনি যাবেন? —অনুরোধের গাঢ়তা তার কণ্ঠস্বর।

—যাবো না? —কথাটা এভাবে আমি বলে ফেললাম যে আমি যাবো না এ কখনো হতে পারে?

তার নীচু করা মুখে রক্তিম উচ্ছ্বাস— সেদিকে তাকিয়ে কম্পিত গলায় আমি বললাম— আমরা কখন বেরুবো?

—একসঙ্গে? এই বাড়ি থেকে? না না, সে আমি কিছুতেই পারবো না— ফিসফিস করে বলল সে, মাথা ঝাঁকালো।

—তাহলে? —আমি ব্যাকুল, বুঝি এখনি বাতিল হয়ে যায় এমন দুর্লভ অভিযান।

—তাহলে? —জিজ্ঞাসা করে সেও।

আমি একটু ভাবি, তারপর বলি, তাহলে আমি বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়াবো?

—ঠিক আছে— বলতে বলতে চলে যেতে চাইল বনশ্রী।

—কিন্তু কখন —আমি অস্থির।

—চারটের সময় —বলেই বেরিয়ে গেল সে!

এখন মাত্র দুটো বাজে। আজ পৃথিবীর দীর্ঘতম দুপুর।

তারপর।

ভালো পোষাক আসাক আমার বিশেষ নেই, তবু ওরই মধ্যে বাছাই করে পাঞ্জাবী পায়জামা পরলাম। আয়নায় অনেকক্ষণ ধরে মুখ দেখতে দেখতে আজ প্রথম আমার মনে হলো নিজেকে তো সবাই সুন্দর ভাবে, কিন্তু সত্যিই আমি দেখতে কেমন? অনেকক্ষণ ধরে যাচাই করলাম কিন্তু বুঝতে পারলাম না।

আধঘণ্টা আগেই আমি বাড়ি থেকে বেরুলাম, কিন্তু বাসস্ট্যান্ড কতটুকুই বা— পলকে পৌঁছে গেলাম। এখান থেকে একটি মিনিবাস যাতায়াত করে ধর্মতলা পর্যন্ত। মিনিবাস দাঁড়িয়েছিল ফাঁকা, জিজ্ঞাসা করতে কণ্ডাকটর বলল— ছাড়তে দেরি আছে উঠে বসলাম।

...তারপর কত দীর্ঘকাল অপেক্ষায় আমি...সূর্যপরিক্রমনায় পৃথিবী আরও কতদূর এগিয়ে গেল...আমি আগমন পথের দিকে চেয়ে...

আকাশে কিছু কিছু হালকা মেঘ মাঝে মাঝে আড়াল করে সূর্য, রৌদ্র ম্রিয়মান, কন্ডাক্টর সীটে বসে ঘুমায়, মাঝে মাঝে মাথা নুয়ে পড়ে, সোজা হয়। সামনের সীটের হাতলে একটা মাছি পেছনের দুপা দিয়ে ডানা মাজে, ফাঁকা রাস্তা শুয়ে থাকে একা।

ফাঁকা রাস্তাটা বাঁক নিয়ে আমার বুকের মধ্যে ঢুকে যায়...নুড়ি ও পাথর...শুধু নুড়ি ও পাথর...আর ধুলো ওড়ে— ধূসর করে দেয় সমস্ত ভুবন।

ও কি আসছে? বনশ্রী? ফুলে ফুলে বোনা হয়েছে কি শাড়ি তার? আমি হাত নাড়লাম।

পাশাপাশি দু'জন। বনশ্রী জানালার ধারে মুখ নীচু করে কোলের ব্যাগ নিয়ে ব্যস্ত, আমি তাকিয়ে উল্টো দিকে। ক্রমশঃ বাস ভর্তি হ'য়ে উঠছিল এবং এক সময় গতিময়। আমি ভাল করে দেখে নিলাম চেনাশোনা কেউ আছে কিনা— না নেই, তবু সমস্ত পথ আমরা দু'জন কোন কথা বললাম না, অথবা বলতে পারলাম না। কিছু স্পর্শ কিছু সুগন্ধ কেমন এলোমেলো করে দিচ্ছিল সবকিছু।

ধর্মতলায় মনুমেন্ট অবধি বাসের দৌড়। আমরা নামলাম। ঘড়ি দেখলাম— সাড়ে চারটে।

আমি ঘড়ি দেখায় বনশ্রীও ঘড়ি দেখল।

—কটায় শো? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—সাড়ে ছ'টায়।

—তাহলে তো অনেক দেরী।

—দেরী আছে তবে অনেক নয়, 'মেকআপ' নিতে হবে 'ড্রেস' করতে হবে, তাছাড়া শেষ মুহূর্তে আরও কিছু ঝালিয়ে নেওয়া—

—তাহলে বাসে ওঠা যাক।

—আমি বলছিলাম কি— মাঠের মধ্যে দিয়ে সোজা হেঁটে গেলে কেমন হয়?

—তার চেয়ে ভালো আর কিছুই হয়না— আমি আলতো গলায় বললাম।

তারপর বাসের জঙ্গল পেরিয়ে দক্ষিণ মুখে একটু হাঁটলেই বিশাল ফাঁকা রাস্তা, তাঁবু, গাছপালা, সবুজ মাঠ।

প্রাচীন সব বৃক্ষের নীচে দিয়ে আমরা হাঁটছিলাম এবং যেভাবে বৃক্ষেরা আমাকে সম্মোহিত করে— আমি ক্রমশ শান্তির গভীরে ডুবে যাচ্ছিলাম। ওপরে মুখ তুললে পাতার বিচিত্র বাহার এবং আকাশের কুচি। যেতে যেতে আমি প্রতিটি গাছের গায়ে হাত রাখছিলাম এবং এভাবে আমি কোন কোন গাছের কাছে একটু দাঁড়িয়ে পড়ছিলাম।

এভাবে দাঁড়াতে গিয়ে বারবার বনশ্রীর সঙ্গে চোখাচোখি, ও হাসছিল, আমি হাসছিলাম। একসময় হেসে বনশ্রী বলল— আপনার গল্পের ওই মানুষটিকে আমি চিনতে পারছি।

তীব্র হর্ন দিল একটা গাড়ি আমি কিছু বলতে গিয়ে থমকে গেলাম। যে রাস্তা আমরা

হেঁটে এলাম এটা বেশি দীর্ঘ নয়, এখন সামনে একটা ক্রসিং, আমরা দ্রুত রাস্তা পেরুতে গিয়ে গাড়ির হর্ন— বনশ্রী আমার বাহু আঁকড়ে ধরল, পরক্ষণে ছেড়ে দিল— একটা গাড়ি হুস্ করে চলে গেল পিছন দিয়ে— ততক্ষণে আমরা এপারে। একটু সঙ্কোচের হাসি হেসে বনশ্রী বলল— এমন ভয় পেয়েছিলাম?

একটু ঢালু মাটি পেরিয়ে আমরা মাঠে নামলাম।

এখানে ইতস্ততঃ অনেক বড় বড় গাছ, গাছেদের পাশ দিয়ে দিয়ে আমরা ঘাস জমিতে পা দিলাম। সামনে বিশাল ময়দান, দূরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চূড়া। আকাশে মেঘসঞ্চার, কালো মেঘের বুকে সাদা চূড়া ভারী সুন্দর লাগছিল। চারদিকে সবুজ আর সবুজ ঘাস, দূরে দূরে গাছেদের বেষ্টনী। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল এখানে একটু বসি কিংবা শুই, একটু মুখ রাখি সবুজ ঘাসে।

—একটু বসলে হয় না? মাত্র পাঁচ মিনিট— আমি প্রার্থীর মতো বললাম।

বনশ্রী টুপ করে বসে পড়ল, আমি বসলাম মুখোমুখি, ঘাসে আলতো হাত বোলালাম আমি, দীর্ঘ নিঃশ্বাসে বুকে ভরে নিলাম বাতাস, আর তখনই মনে পড়ে গেল বনশ্রীর কথা—গল্পের মানুষটি— তাহলে চুরি করে পড়া হয়েছে? উঁ! —বললাম আমি।

বনশ্রী মিটি মিটি হাসছিল, ক্রমশ তার চোখ দুটি কেমন মায়াময় হয়ে গেল, খুব আস্তে আস্তে বলল, আপনি প্রকৃতিকে বড় ভালবাসেন তাই না?

আমি ধীরে ধীরে ঘাসে শুয়ে পড়লাম, ঘাসের ওপর গাল রাখলাম, বললাম— প্রকৃতিই তো জীবন।

পূর্ব দিক থেকে বাতাস বইছিল। আকাশে মেঘেরা ক্রমশ জড়ো, গাছেরা ঝিরঝির গান করছিল। আমি চিত হয়ে শুনলাম, আকাশ দেখলাম গাছেদের দেখলাম। শরীরে আর্দ্র মাটির স্পর্শ। আমি জুড়িয়ে যাচ্ছিলাম। ক'দিনের যে অসুস্থতা আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল তা সরে যাচ্ছিল, আমি আরোগ্যলাভ করছিলাম।

—উঠতে হবে না? —বনশ্রী বলল।

আমি একটি হাত বাড়িয়ে দিলাম তার দিকে— মুহূর্তের দ্বিধা তারপর সে আমার হাত ধরল, পরক্ষণে ছেড়ে দিল।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। কেমন একটা ঝিম্‌ঝিম্ ভাব সারা শরীরে। বনশ্রীও উঠে দাঁড়িয়েছে, তার আঁচল উড়ছে পূবালী হাওয়ায়, উড়ছে চুল। আমারও পাঞ্জাবী পত্‌পত্ শব্দে উড়ছিল। কি যে ভাল লাগছিল!

—আরও দাঁড়িয়ে থাকলে বৃষ্টিতে নির্ঘাৎ ভিজতে হবে— বলল বনশ্রী।

—তাইতো— আমি ব্যস্ত হলাম।

প্রশান্ত হাওয়ার রাজ্য— আমরা হাঁটতে লাগলাম পাশাপাশি। বিস্তীর্ণ ময়দানের ঠিক

মধ্যস্থলে যখন আমরা পৌঁছলাম চারিদিক তাকিয়ে দেখলাম শুধু আমরা দু'জন, আর কেউ নেই। এই সুখের হাঁটা আরও দীর্ঘ হোক— আমি মনে মনে বললাম।

প্রেক্ষাগৃহের আলোকে উজ্জ্বল দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে আমরা যখন উঠছিলাম তখন ঝিরঝির বৃষ্টি— আমরা দ্রুত উঠে এলাম, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দুজনেই হাসলাম। এদিক থেকে ওদিক থেকে দু'একজন বনশ্রীকে ডাকাডাকি করছিল, বনশ্রী হাত তুলে ঘাড় কাত করে তাদের সকলকে সম্ভাষণ জানাল। ডানদিকের সিঁড়ির মুখে একটি আইসক্রীমের দোকান ওখানে একটু দাঁড়ালো বনশ্রী, বলল— অনুষ্ঠান শেষে ঠিক এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন, যতক্ষণ না আমি আসি— কেমন? হলের ভেতরে গিয়ে বসুন। কাঁধের ঝোলাব্যাগে হাত ঢুকিয়ে কার্ড বার করল সে, আমার হাতে দিলো, তারপর দ্রুতপদে চলে গেল।

আমি চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। চারিদিকে প্রসারিত মানুষ মানুষী, সুগন্ধ, কলকাকলি, কিন্তু আমার কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল, মনে হচ্ছিল একা আমাকে ফেলে রেখে বনশ্রী কোন আনন্দ সমাবেশে চলে গেছে। আমি আস্তে আস্তে হলে প্রবেশ করলাম। অনুষ্ঠান আরম্ভ হতে দেরী আছে, আমি আলো হাতে আসন দর্শানো মানুষটিকে কার্ডটি দিলাম, পলক দেখে সে আমাকে সামনের দিকে যেতে বলল। সামনে এগিয়ে যেতে আরেকজন আমার কার্ড দেখে প্রথম দিকের সারিতে আসন দেখালো, আমি বসলাম। এটা মর্যাদাসম্পন্ন অতিথিদের আসন, আমি বুঝতে পারলাম। এমন মর্যাদাসম্পন্ন আসনে বসে আমি কখনও কোন অনুষ্ঠান দেখিনি। কেমন একটা গর্বমিশ্রিত ভাললাগা নিয়ে আমি চুপচাপ বসে রইলাম।

তারপর....কি আশ্চর্য রূপময় বর্ণময় সঙ্গীতময় নৃত্যের হিল্লোল... প্রস্ফুটিত সহস্র পদ্ম ভাবহীন শূন্যে ভেসে থাকে, বাতাসের মৃদু স্পর্শে ঝরে পড়ে সুগন্ধ পাপড়ি...স্তূপাকার পাপড়িগুলি ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ ঢেকে ফেলে চরাচর...কোথা কেউ নেই শুধু নৃত্যরতা বনশ্রী... লীলায়িত তনু ডুবে যায় সুগন্ধি পাপড়ির স্তূপে...ডুবে যায় সঙ্গীত মূর্চ্ছনা...ডুবে যায় সব বর্ণমালা...ক্রমশঃ নৈঃশব্দ নামে আশ্চর্য গভীরে...

কাহিনী চরিত্র ঘটনাপরম্পরা এসব কিছুই আমি বুঝিনি। কথা কিংবা সংলাপ, গান কিংবা যন্ত্রসংগীত এ সবকিছুই হয়তো ছিল, কিন্তু আমি শুনিনি। আমি যা দেখেছি তাই কি ঘটেছে মঞ্চে? আমি জানিনা। সহস্র প্রস্ফুটিত পদ্ম ভারহীন শূন্যে ভাসমান...বাতাসের ঘায়ে ঝরে যায় অজস্র পাপড়ি....

পর্দা ঢেকে দেয় মঞ্চ। আলো জ্বলে ওঠে। মানুষের কলরবে ভরে যায় প্রেক্ষাগৃহ। সকলে বাইরে যেতে ব্যস্ত। আমি সুখাবেশে চুপচাপ বসে থাকি। অনেকক্ষণ পর যখন প্রেক্ষাগৃহ শূন্য তখন আমি উঠে আস্তে আস্তে পা ফেলে বাইরে আসি, নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দাঁড়াই।

আইসক্রীম কাউন্টার খালি পড়ে, বিক্রেতা জিনিষপত্র গুটিয়ে চলে গেছে, আমি কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়াই। দ্রুত খালি হয়ে যাচ্ছে 'লবি'। নরনারী ব্যস্ত বাড়ি ফিরতে। কলরব থিতিয়ে প্রায় নৈঃশব্দ্যে বিলীন। কখন আসবে তুমি স্বর্গের অপ্সরী মর্তের বন্দনা নিতে? রাত কি শেষ হয়ে এলো? এলো পাখীডাকা ভোর? বৃথা অপেক্ষা, এবার সূর্য উঠবে, আমাকে ফিরতে হবে একা। মিথ্যে আশা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি দীর্ঘ রাত, আছি ঘুমঘোরে স্বপ্নসুখ নিয়ে...

কিন্তু ও যে কথা দিয়েছিল। বলেছিল—

—কোন রকমে মেক্‌আপ তুলে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছি, ওরা সব ছাড়তে চায় না।

হাসিভরা কি সুন্দর মুখ তার! বলল— শাড়িটাও গুছিয়ে পরা হয়নি।

আমি অনেক কিছু বলতে চাইছিলাম, কিন্তু—

...বিশেষ কোন কারণ নেই তবু তুমি কাছে এলে বুকের মধ্যে জলপ্রপাতের শব্দ...একপাল চিত্রল হরিণ যেন বুকের ভিতর দ্রুতবেগে ছুটে চলে যায়

...বিশেষ কোন কারণ নেই তবু তুমি কাছে এলে ঘিরে আসে সজল মেঘের ছায়া...যেন মেঘবতী আকাশ নুয়ে পড়ে মাটির কানায়...

...একদিন তুমি আমি পরস্পর হাতে হাত রেখে ভেসে যাবো হাওয়ায় হাওয়ায়...একদিন তুমি আমি পরস্পর চোখে চোখ রেখে বুক ভরে নেবো আনন্দ সুধায়... বিশেষ কোন কারণ নেই তবু— এইসব কথা তোমাকে বলতে গেলে বুকের দুপাড় ভাঙে কোন এক নদী, সব কথা স্রোতে ভেসে যায়...

আমার অপলক মুগ্ধ দৃষ্টিতে বনশ্রীর দৃষ্টি মিললে সে কেমন কেঁপে উঠল, চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল—কি? কি আশ্চর্য প্রশ্ন বনশ্রীর—'কি'! আমি আকাশ খুঁজলাম, বাতাস খুঁজলাম বনশ্রীর প্রশ্নের উত্তর কি? বনশ্রীর প্রশ্নের অর্থ কি?

মুখ তুলে তাকাল সে, তার দীর্ঘ আঁখিপল্লব আরও দীর্ঘ করে রেখেছে এখনও কিছু রূপসজ্জা, আয়ত চোখ দুটি সে কিন্তু স্থির রাখতে পারল না, পুনরায় মুখ নামিয়ে নিল, বলল— এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে? বাড়ি ফিরতে হবে না?

অতঃপর...আমি এক রূপকথার রাজপুত্র...প্রাসাদের দীর্ঘ সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছি, পাশে রাজকন্যা...ওখানে কোথায় যেন বাঁধা আছে ফুটফুটে সাদা এক তেজী ঘোড়া— একলাফে উঠে যাবো পিঠে তার... হাত ধরে তুলে নেব প্রেয়সী আমার...পলকে উধাও বাতাসের বেগে!

আমাদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য কর্মকর্তারা গাড়ি দিচ্ছেন— সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল বনশ্রী— ওদিকে যেতে হবে— হাত তুলে সদনের পেছন দিক নির্দেশ করল সে।

আমরা ফটক দিয়ে বেরিয়ে এলাম, এদিকটা আলো কম, রাস্তা দিয়ে একটু এগিয়ে পিছনের ফটক— আমরা ভিতরে ঢুকলাম।

মুহূর্তের মধ্যে বনশ্রী আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন অনেকে মিলে ঘিরে ধরেছে ওকে, তারা সকলে কত কথা বলছিল, কত গুণগান, প্রশ্ন করছিল— কোথায় ছিল সে এতক্ষণ, বনশ্রী হাসিমুখে তাদের উত্তর দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছিল।

আমার বুকের মধ্যে কেমন ব্যথা...আমি দু'পা পিছিয়ে এলাম। নিজেকে মনে হচ্ছিল অবাঞ্ছিত।

আরেকটু এগিয়ে বনশ্রী একজন বয়স্ক ভদ্রলোককে কি যেন প্রশ্ন করল, তিনি হাত তুলে কি যেন দেখালেন, বনশ্রী এগিয়ে গেল যেদিকে সারিবদ্ধ গাড়িগুলি দাঁড়িয়ে। একটি সাদা রঙের গাড়ির কাছে পৌঁছাল সে এবং এদিক ওদিক তাকাল।

দূরে আমাকে দেখতে পেয়েছে সে—আমি বুঝতে পারলাম, দ্রুতপদে আমার কাছে , এগিয়ে এলো, বলল— বারে! এখানে দাঁড়িয়ে যে?

আমার মুখে কি আঁকা ছিল ব্যথার ছাপ? বনশ্রী কি বুঝতে পারল? আমি দেখলাম তার চোখ দুটি মায়াময় ভালবাসায় ভরে উঠল, কয়েক মুহূর্ত অপলক তাকিয়ে থেকে অস্ফুট স্বরে সে বলল— এসো।

একি অমৃত বর্ষণ! চারদিকে বেজে উঠছে বর্ষণ ঝঙ্কার...আমার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে দিলো কি যে হিল্লোল! এতো সুখ আছে জীবনে!

আমরা এগোলাম। গাড়ি এগিয়ে আসছে। আমি বুঝতে পারছিলাম সকলে এখন আমাকে দেখছে। কিছুক্ষণ আগের অবাঞ্ছিত অনুভবের জন্য আমি বনশ্রীর কাছে মনে মনে ক্ষমা চাইলাম। গাড়ী আমাদের পাশে থেমেছে, বনশ্রী দরজা খুলে ধরল, মান্য অতিথির মতো আমাকে উঠিয়ে তবে সে উঠল, দরজা বন্ধ করল।

ফটক পেরিয়ে গাড়ি গতি নিচ্ছে। দুপাশে ছুটে যাচ্ছে আলোকস্তম্ভ। ভিতরের অন্ধকার মাঝে মাঝে সরে যাচ্ছে— ভেসে উঠছে বনশ্রীর আত্মমগ্ন মুখ— মুহূর্তে অন্ধকারে আড়াল। কি এতো ভাবছে ও? আমার দিকে দেখছেও না, সামনের দিকে তাকিয়ে স্থির। আমি হাত বাড়ালাম, আসনের ওপর রাখা বনশ্রীর হাতের ওপর হাত রাখলাম। ও কি কেঁপে উঠল?

তারপর...

আমি আমার বাম বাহুমূলে তার গালে স্পর্শ পেলাম। ক্লান্ত শিশুর মতো মাথা এলিয়ে দিয়েছে সে, চোখ বুজেছে। দীর্ঘ নিঃশ্বাসে বুক ভরে নিল বনশ্রী— আমি বুঝতে পারলাম। তার দীর্ঘশ্বাসের ছোঁয়া লাগল দেখি আমাকেও, আমিও বুক ভরে শ্বাস নিলাম, চোখ বুজলাম...

...এখন জেগে থাক শুধু অনুভব— মাথার ওপর বর্দ্ধিষ্ণু তরু এক ঝরিয়ে দিচ্ছে ফুলভার...সুগন্ধ ছড়িয়ে যাচ্ছে চেতনায়...

একটি চড়ুই পাখি রোজ আসে সকাল বেলায়। জানালা থেকে মেঝেয়, মেঝে থেকে টেবিলে এবং কখনও আমার তক্তাপোষের ওপর সে লাফালাফি করে, কেন জানি না। চিক্ চিক্ কিচ্ কিচ্ নানাবিধ শব্দে ডাকাডাকি করে, কি বলে জানি না।

আজও সে এসেছিল, অনেকক্ষণ খেলেছিল, তারপর চলে গেছে সেও অনেকক্ষণ। এখন আর সকালও নেই।

আমার লেখার খাতায় সেই সকাল থেকে এতক্ষণ দেখছি জমা পড়েছে কিছু হিজিবিজি আর কাটাকুটি।

আজ সকালে মা মুড়ির সঙ্গে আলুবড়া ভেজে দিয়েছিল, আর ছিল চা। তক্তাপোষে দিব্যি বাবু হয়ে বসে খেতে খেতে কাজ শুরু করেছিলাম। প্রায় এক বছর ধরে যে প্রণয় উপন্যাসটি বেশ কিছুটা লিখে পড়েছিল আজ অনেকদিন পর ওটা নিয়ে বসেছিলাম। আমার জীবনে ইদানিংকালের ঘটনাবলী আমাকে জানিয়ে দিয়েছে প্রণয় সম্পর্কিত কোন অনুভবই আমি ওই লেখার মধ্যে ফোটাতে পারিনি।

আজ বৃহস্পতিবার। আজ বাজার যাবার দরকার নেই। মায়ের সঙ্গে আমাকেও আজ নিরামিষ খেতে হয়। অতএব নিশ্চিন্তে লেখাটি বার করে পড়তে শুরু করেছিলাম। তারপর কখন বসা ছেড়ে উপুড় হয়েছি এবং এখন দেখছি আমি চিৎপাত শুয়ে আছি। ঘূর্ণায়মান পাখার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কত কি আর দেখবো? আসলে আমার বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে গেছে একটা পায়ে চলা পথ, সে পথ দরজা পেরিয়ে বারান্দা পেরিয়ে ওদিকে কোথায় চলে গেছে, সেই পথটির প্রান্তে চোখ রেখে আমি সকাল থেকে অপেক্ষায়। কিন্তু পথ শূন্য পড়ে আছে।

আমার মাথার দিকে দরজা খোলাই আছে তবু খোলা দরজার কড়ায় খুটখাট শব্দ হচ্ছে শুনছি। এখন আমি চোখ বুজিয়ে নেবো, এখন আমি ঘুমিয়ে পড়বো, অতএব কিছুই শুনতে পাবো না।

ঘরের মেঝেয় খস্‌খস্ শব্দ, আমার খুব কাছে, এবং অস্ফুট সংলাপ— এই।

আমি কেঁপে উঠলাম। এই সামান্য শব্দ এত শিহরণ আনতে পারে?

যদিও আমার নিদ্রার ভান ধরা পড়ে গেছে, তবু আমি চোখ বুজেই রইলাম।

—কি করব, বাবা অফিস বেরোলেন, ভাই স্কুলে গেল তবেই না আসতে পারলাম! আমার বুঝি লজ্জা করে না! —এত আস্তে কথা বলল বনশ্রী প্রায় শোনাই যায় না।

...টুপ্ শব্দে ঢিল পড়ে শান্ত দীঘিতে, বৃত্তাকার ঢেউগুলি ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হয়ে যায়, ভাসা ঢেউ ভেসে ভেসে ক্রমশঃ বিলীন, পুনরায় শব্দ ওঠে টুপ, পুনরায় ছড়িয়ে যায় ঢেউ... এরকম খেলা চলে কতক্ষণ বুকের ভিতর।

আমি চোখ খুললাম, উঠে বসলাম, বনশ্রীর মুখের দিকে মুখ তুলে তাকালাম, অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম চুপচাপ।

দিবসের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত বনশ্রীর মুখ। মিষ্টি চিবুক, গাল, কানের পাতায় সবুজ পাথর বাঁধা দুল, এলোখোঁপা— সব কিছু মূর্ত্তির মতো স্থির।

সব কিছু কি সুস্থির। এখন আমার বুকে তরঙ্গও নেই। হাজার বছর আমি এরকম স্থির শুধু চেয়ে আছি। —কত দীর্ঘকাল অপেক্ষায়— আত্মমগ্ন বললাম আমি।

—কতকাল?

—হাজার বছর ধরে... জন্ম থেকে জন্মান্তর...

বনশ্রী দাঁড়িয়ে, আমি বসে। ওর মুখের ওপর দৃষ্টি রাখতে আমাকে অনেকখানি মুখ উঁচু করে রাখতে হয়েছে। এভাবে আমি কেমন দুর্বল। 'হাজার বছর ধরে'— বলতে গিয়ে আমার বুকের মধ্যে সত্যই হাজার বছরের অপেক্ষার ভার ব্যথা দিলো। কণ্ঠস্বর বনশ্রী কি বুঝল সেই ব্যাকুলতা? প্রায় চমকে তাকাল। আমি তার দিকে আমার ডান হাত তুলে ধরলাম। বুঝতে পারছিলাম আমার হাত কাঁপছে।

কম্পিত হাতে আমার হাত ধরল বনশ্রী, হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল মেঝেয়, বলল— এমন করে বলোনা।

...টুপ শব্দে ঢিল পড়ে বুকের ভিতর, বৃত্তাকার ঢেউগুলি ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হয়ে যায়...

...শতাব্দী পেরিয়ে যায়...

—খোকা, স্নান করে নে,—ওপর থেকে মায়ের ডাক— চমকে হাত সরিয়ে নিলাম দুজনেই, তারপর সলজ্জ হাসি।

—আজ দুপুরে আমরা বেড়াতে যাবো— বললাম আমি।

—কোথায়?

—হাওড়া স্টেশন থেকে একটা ট্রেনে উঠবো, তারপর সে একটা স্টেশন— এতো সুন্দর! দেখবেখন! সেখানে নেমে হাঁটতে হাঁটতে বেড়াতে বেড়াতে যতক্ষণ মনে হবে ফেরার সময় মাত্র হাতে আছে তখন ফিরবো।

বনশ্রী এমন চোখে তাকাল! সে কি শঙ্কা না বিস্ময়?

আমি বললাম— ভয় নেই, নিরুদ্দেশে যাবো না।

—গেলেই বা কি! —বলেই বেরিয়ে গেল সে।

এরকম মনে হয় আমার জীবনের ঘটনাবলী আমাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে

চাইছে, এভাবেই অতি দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে দৃশ্যপট। কিংবা যেমন দুরন্ত বাতাসের সামনে নিঃশ্বাস নেওয়া দায় হয়ে ওঠে— তেমন কিছু।

এই যে দ্রুতগামী ট্রেন— জানালার ধারে বনশ্রী, পাশে আমি, দুরন্ত হাওয়ায় উড়ছে ওর চুল, আমার মুখে সূক্ষ্ম স্পর্শ— আমার একক জীবনে এত দ্রুত এসে গেছে এই দৃশ্য! এ অভাবিত! আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারি না।

বনশ্রীর সঙ্গে বেরোবার কথা হলেই এমন এক উত্তেজনাময় অস্থিরতা সারাক্ষণ! খেতে বসে ভাল করে খেতে পারিনা, পাকস্থলীর মধ্যেও সেই অস্থিরতা গুরুগুরু করে। সেই নৃত্যানুষ্ঠানে যাওয়ার দিন যেমন হয়েছিল।

আজও ঠিক তাই! খাওয়া দাওয়া প্রায় হয়নি বললেই চলে। মা বলছিল— কি হলো কিছুই তো খেলি না। কাল থেকে দেখছি তোর খিদে নেই, কি হয়েছে রে? শরীর খারাপ?

আমি কি বলি? কোন রকমে ঘাড় নেড়ে জানিয়েছি— না। অথচ এখন— যখন বেরিয়েই পড়েছি, পাশাপাশি বসে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছি— আর সে অস্থিরতা নেই। বরং এখন এক স্নিগ্ধ আনন্দ।

বৃক্ষেরা এমন ছুটোছুটি করছে কেন বাইরে? এমন আপন মনে ঘুরছে কেন প্রান্তর? বনশ্রীকে এসব কথা আমার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু চারপাশে এত লোকজন! আমাদের সামনের আসনে এই যে বয়স্ক ভদ্রলোক মাঝে মাঝেই যেভাবে চোখ কুঁচকে তাকাচ্ছেন! ওঁর পাশের জন অবশ্য একমনে খবরের কাগজ পড়ছেন। এদিকে আমার পাশের ভদ্রলোক তো কান খাড়া করে আছেন মনে হচ্ছে— কখন আমি কি বলি।

কত কথা মনে আসে কিছুই বলা হয় না। বনশ্রীও সেই যে বাইরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসেছে! প্রায় একঘণ্টা হতে চলল এতক্ষণ মুখ ফিরিয়ে দেখেছে মাত্র দুবার। তাও এক পলক।

আমরা দুজন ছাড়া আর কোন যাত্রী নামেনি। আমাদের নামিয়ে দিয়ে হলুদ সবুজ ট্রেন বাঁশি বাজিয়ে চলে গেল, তারপর সব সুনসান। পূর্বদিক থেকে হালকা বাতাস বইছে, আকাশে বর্ষার মেঘছায়া।

—আমরা এখানে কোথায় যাচ্ছি? জিজ্ঞাসা করল বনশ্রী!

—কোথাও না।

—তবে?

—একদিন ট্রেনে যেতে যেতে এই জায়গাটা খুব ভালো লেগেছিল, মনে হয়েছিল একদিন বেড়াতে আসবো, একাই আসতাম, সঙ্গী পেয়ে গেলাম।

চুপচাপ কয়েক মুহূর্ত বনশ্রী দেখল, চোখে তার ভ্রূকুটি না কি ছদ্মশাসন?

স্টেশনের গায়েই একটা বড় পুকুর, তার অনেকটা জুড়েই পদ্মবন। এদিকে ঘাট, ঘাটে স্নান করছে একটি লোক।

—টুপটুপ্ ডুব দিচ্ছে আর দিচ্ছে, ইস্! —বলল বনশ্রী, —আমার এমন নামতে ইচ্ছে করছে! আমি কিন্তু খুব কাছে গিয়ে পদ্মবন দেখবো, এত কাছ থেকে কখনও আমি পদ্মবন দেখিনি, —বলতে বলতে বনশ্রী প্ল্যাটফর্মের ঢালু গা বেয়ে নেমে চলল— মাগো কত ফুল!

—অত জোরে নেমো না, পড়ে যাবে— ওর পেছনে ছুটলাম আমি।

খিলখিলিয়ে হেসে উঠল সে, সুর করে বলল— ধরতে পারে না! — তারপর আরও ছুট।

কি কথা। ধরতে পারে না। সে কথার সুর দেখি লেগে গেল পদ্মবনে, জলঘাসের পাতায় পাতায়, ভিজে মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে গেল সে সুর ধানের চারাগুলি ছুঁয়ে। আকাশে উঠল গুরুগুরু ধ্বনি।

অনেকদিন আমি একা একা বেরিয়েছি, ঘুরেছি আপন মনে, আনন্দও পেয়েছি, কিন্তু এমন অপার আনন্দ? পুলকিত সর্বচরাচর আমাকে খিলখিলিয়ে হেসে ডাক দিচ্ছে— ধরতে পারে না...। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম, আকাশ প্রান্তর বৃক্ষমেলা দেখলাম, এত আনন্দ আমি নেবো কি করে!

পুকুরের ওপারে পৌঁছে গেছে বনশ্রী, আমি এখনও এপারে, আমার দিকে ফিরে সে হাসিমুখে হাত নাড়ল, আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম।

এদিকে আসবার কোন পথ রেখাও দেখছি নেই। ঘাস মাটি মাড়িয়ে মাড়িয়ে ও এসেছে, আমিও এলাম, পাশে এসে দাঁড়ালাম।

একমনে ফুলগুলির দিকে তাকিয়েছিল বনশ্রী, আনমনে বলল— খুব গভীর জল, তাই না?

—কেন? ফুল নেওয়ার ইচ্ছে?

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বনশ্রী বলল— থাকনা ফুল যেমন আছে ফুটে— কেমন উদাস গলায় কথাগুলি বলল বনশ্রী, উবু হয়ে বসল, হাঁটুর ওপর চিবুক, পদ্মবনের দিকে তাকিয়ে আনমনে বলল— ফুল কিছুক্ষণ মানুষ ভালবাসে, নড়াচাড়া করে, সুগন্ধ নেয়, তারপর নেতিয়ে পড়লে হয়তো বা একটা একটা করে পাপড়ি ছেঁড়ে, অবহেলায় ফেলে দেয়।

বনশ্রীর উদাস কণ্ঠস্বরে সহসা সমস্ত আবহাওয়াটাই কেমন উদাস হয়ে গেল, আমার উৎফুল্ল বুকেও ব্যথার ছোঁয়া, ওর পাশে বসলাম আমি, বললাম— এ যে তত্ত্বকথা বনশ্রী, শুনে মনে হয় তোমার জীবনের কোন দুঃখবোধ।

বনশ্রী চুপ করে শুনল আমার কথা, কিন্তু মুখও ফেরাল না, কোন উত্তরও দিল না।

—তোমার কথা আমাকে বলো বনশ্রী! —গভীর আবেগে বললাম আমি।

এবার বনশ্রী মুখ তুলল, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে গাঢ় গলায় বলল— আমার

কোন কথা নেইগো, সাধারণ ঘরে খুবই সাধারণ ভাবে মানুষ হয়েছি, লেখাপড়া শিখেছি, বড়ো হয়েছি। শখের মধ্যে নাচ— মন দিয়ে শিখতে চেষ্টা করেছি, পরিশ্রম করেছি, কতটুকু সফল হয়েছি জানিনা— এভাবেই কেটে যাচ্ছিল সাদামাটা জীবন, ব্যতিক্রম ছিল শুধু মাঝে মধ্যে দু'একটা নাচের অনুষ্ঠান। কিন্তু তারপর— হঠাৎ কি যে হলো— তুমি এলে আলো আর গান আর আনন্দ...আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না— বলতে বলতে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজলো বনশ্রী, মৃদু গলায় বলল— কিন্তু বড় ভয় করে, নিজেকে খুব অসহায় লাগে, মনে হয়— মনে হয় যদি উৎসব শেষের অবহেলায় পড়ে থাকা মঞ্চের মতো আমাকে তুমি একদিন—

—বনশ্রী —আর্ত গলায় ডাকলাম আমি।

বনশ্রী চমকে উঠল, মুখ তুলে তাকাল, ওর চোখ দুটি ছলছল, কাঁপা গলায় বলল— আমাকে ক্ষমা করো!

...প্রতিটি মুহূর্তে মেলে যাচ্ছে নতুন নতুন পাপড়ি...কুঁড়ি থেকে ফুল...ছড়িয়ে পড়ছে সৌরভ...পদ্মবনের হাওয়া লেগেছে আমাদের গায়ে, আর বাতাস লাগলে মানুষের জ্ঞান হুঁস থাকে নাকি? উঠে দাঁড়লাম আমি, জোরে জোরে বললাম জানো বনশ্রী, আমার বুকের মধ্যে কোথায় উড়তে উড়তে ঢুকে পড়েছে পদ্মবনের এক প্রজাপতি, এমন ফুরফুর করে ডানা নাড়ছে— বলতে বলতে আমি বাতাস লাগা মানুষের মতো উদ্দাম হাসিতে ভরিয়ে দিলাম আকাশ বাতাস ত্রিভুবন...

—এই, থামো! এই— বনশ্রী বলল উঠে দাঁড়াল। আমার হাসি থামে না।

—এই —বনশ্রী আমার বাহু ধরে ঝাঁকুনি দিলো, আমি আস্তে আস্তে হাসিকে প্রশমিত করলাম।

—পাগল!

—পাগলই তো! আমি বনশ্রীর কাঁধে আমার বাঁ হাত জড়িয়ে দিতে চাইলাম।

এঁকে বেঁকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বনশ্রী দে ছুট!

উঁচু মাটির পথ স্টেশন থেকে ওই চলে গেছে গ্রামের দিকে। দূরে গাছ-গাছালির ফাঁকে গ্রামের আভাস। বনশ্রী ছুটে উঠে পড়েছে পথের ওপর, দাঁড়িয়ে পড়েছে। পথের দূর প্রান্তের দিকে চেয়ে বোধহয় বুঝতে চেষ্টা করছে গ্রামের দূরত্ব।

আমি রাস্তায় উঠে এলাম।

দূর গ্রামের দিকে হাত তুলে আঙুল দেখিয়ে বনশ্রী বলল— আমরা কি ওদিকে যাবো?

—যাবোই তো।

—যদি বৃষ্টি আসে?

—ভিজবো।

—ইস্!

ততক্ষণে আমরা হাঁটতে শুরু করেছি। মেঘের ছায়ার স্নিগ্ধ পথ। দুপাশে ধানক্ষেত। কচি ধানগাছগুলি হাওয়ায় কাঁপছে।

—গভীর জল দেখলে আমার ছোটবেলার একটা কথা মনে পড়ে যায়— বনশ্রী হাঁটতে হাটতে বলল।

—আমরা আগে যে বাড়িতে থাকতাম ওখানেই আমার জন্ম, ওখানে স্নানঘরের সামনের উঠোনে একটা চৌবাচ্চা ছিল, সব সময় ওটা জলে ভরে রাখা হতো, কখনও একটু বা কম কখনও কানায় কানায়। ছোটবেলায় চৌবাচ্চার জলে দেখতাম আকাশের ছায়া— মনে হতো অতল গভীর। দেখলে কেমন ভয় ভয় লাগত, কেমন একটা রহস্যময় গা ছমছমে ভাব জন্মে গিয়েছিল মনের মধ্যে। মনে হত যদি পড়ে যাই ভেতরে কোথায় তলিয়ে যাবো।

এ পর্যন্ত বলে বনশ্রী হেসে ফেলল।

—হাসছ কেন? —আমি বললাম, এর মধ্যে হাসির কি আছে?

—আছে তো! —বলল সে— একদিন বাবা সব জল ফেলে দিয়ে শ্যাওলা পরিষ্কার করলেন, দুপুরের ঠা ঠা রোদ্দুরে সেদিন দেখলাম ফাঁকা চৌবাচ্চা পড়ে আছে কতটুকুইবা গভীর! কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল বনশ্রী, মুখ নীচু করে কয়েক পা হাঁটল তারপর বলল— সেদিন কিন্তু আনন্দের বদলে দুঃখই হয়েছিল, বুকের ভেতর কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। এখনও মনে পড়লে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

...ঢং ঢং ছুটির ঘণ্টা বেজে যায়... বাজতেই থাকে অবিরাম... ছুটতে ছুটতে পকেট থেকে ছিটকে পড়ে পেন্সিল, আমি কুড়িয়ে নিতে গেলে পেন্সিল গড়িয়ে যায়, ধরতে গেলে ছোট্ট হতে হতে হারিয়ে যায় ঘাসবনে...মুহূর্তে সব ঘাস বেড়ে ওঠে, মাথা ছাড়িয়ে সোজা উঠে যায়, সরু সব দীর্ঘপাতা, ঢেকে দেয় সবুজ আড়ালে...হাওয়া দেয়...কাঁপা কাঁপা সবুজ আড়াল আমাকে ঘিরে থাকে এবং ক্রমশ সে আড়াল পেঁজা তুলোর মত নরম সবুজ কোমল আমাকে ছুঁয়ে যায়, আমি দুহাতে সরাতে চাই...

বনশ্রী কি কিছু বলল? আমি ওর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু সৃষ্টিতে তাকালাম।

—কি ভাবছ? সম্ভবতঃ তার প্রশ্নের পুনরুক্তি করল বনশ্রী।

—ছোটবেলার স্মৃতিগুলি শিউলী গাছে ফুলের মতো— বললাম আমি গাছে আছে বেশ সাজানো আছে, ডাল ধরে নাড়া দিলেই ঝরে পড়ে টুপটুপ কোনটা আগে কুড়োই!

—ছোটবেলার অনেক কথা মনে পড়ে তোমার?

—অনেক, অনেক!

—আমার কিন্তু সামান্য— ছোট্ট মেয়ের মতো গলায় বলল সে, ছোট্ট মেয়ে যে ভাবে কষ্ট কষ্ট গলায় বলে— 'আমার মোটে দুটো পুতুল!' —ঠিক সেভাবে।

—মনে করে করে খুঁজে বার করতে হয়!—

আমি সান্ত্বনার গলায় বলি— এটা একটা সুন্দর খেলা। এক একদিন রাত্রে যখন ঘুম আসেনা তখন চুপচাপ চোখ বুজে বাল্যকালে হারিয়ে যাওয়া।

রাস্তার দুধারে ঢালু মাটিতে বর্ষার জল পেয়ে বেড়ে উঠেছে নানান গাছগাছালি, এক জায়গায় কয়েকটি ধুতুরা গাছ, ফুল ফুটেছে অনেক, হাঁটতে হাঁটতে বনশ্রী সেদিকে এগিয়ে গেল, দাঁড়িয়ে দেখল একটু, মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল— কি ফুল?

—ধুতুরা— আমি বললাম— এখনও ভালো ফোটেনি, সন্ধ্যায় ফুটবে।

মেঘের ফাঁক দিয়ে হঠাৎ একটুখানি উঁকি দিল সূর্য, হালকা রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়ল, মুহূর্তে হেসে উঠল গাছপালা মাঠ বাড়ি ঘর। আমরা এগোলাম। এখন আমাদের সামনে বিশাল এক বটগাছ ঝুরিটুরি নামিয়ে। মোটা মোটা ঝুরির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে পথ। আমরা পায়ে পায়ে গাছের নীচে এসে দাঁড়ালাম। পাতার ফাঁক দিয়ে আলোর জীবন্ত কুচিগুলি ছড়িয়ে পড়েছে মাটিতে, আমাদের গায়েও কিছু ছড়িয়ে পড়ল। বেশ খানিকটা ডাঙা জমি জুড়ে গাছটি দাঁড়িয়ে। মাটি দিয়ে গোড়াটা বেদীর মতো বাঁধানো, সেখানে ছোট বড় কয়েকটি নুড়ি পাথর। বনশ্রী প্রণাম করল। আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম, বেদীর খুব কাছে— বৃক্ষের শরীরে মাথা ছোঁয়ালাম।

চারটে বাঁশের খোঁটা পুঁতে তার ওপর বাঁশের ফালি দিয়ে তৈরি কয়েকটি নীচু বেঞ্চের মতো বসার আসন ওদিকপানে দেখা যাচ্ছে। হয়তো চৈত্র মাসেটাসে এই শিবস্থানে মেলা হয়, তখন কিছু দোকানপাট বসে— তারই ভগ্নাবশেষ। এগিয়ে গিয়ে বনশ্রী একটাতে বসে সামনে পা ছড়িয়ে দিয়ে আরামের নিঃশ্বাস নিলো। বলল— আহ্! কি সুন্দর জায়গা! আমি বাবা আর কোথাও যাচ্ছি না! —পাশের জায়গাটুকু হাত দিয়ে দেখিয়ে আমাকে ডাকল, বলল— বসোতো এখানে।

বর্ষণোন্মুখ মেঘগুলি পশ্চিম আকাশে গিয়ে রচনা করেছে এক জমাট কালো পাহাড়, তার পেছনে সূর্য আধখানা ঢাকা। বর্ণচ্ছটা ছড়িয়ে পড়েছে দীর্ঘ রেখায় একদিকের আকাশে। ওদিকে বিশাল এক সোনার পাহাড়, সোনার নদী ঝাঁপিয়ে নামতে গিয়ে স্থির। আরেকটুকু নীচে থৈ থৈ রাঙা সরোবর...এতো রঙ এখনি বুঝি গড়িয়ে নামবে পৃথিবীতে, ভাসিয়ে দেবে চরাচর...

পশ্চিম আকাশের দিকে মুখ করে আমরা বসেছিলাম। মেঘ ও রঙের বিচিত্র খেলা আমাদের সম্মোহিত করেছে। আমাকে আকাশ চিরকালই ভোলায়, বনশ্রীও দেখছি আমার পথের পথিক। মুখ ফিরিয়ে ওকে দেখলাম। ও যে আরও অপরূপ! আকাশের রঙে এতো প্রসাধন?

আরাম করে বসেছে বনশ্রী, হেলান দেওয়ার জন্য পেয়ে গেছে একটা ঝুরির স্তম্ভ। একটা দীর্ঘ হাই উঠলে লজ্জায় হাত দিয়ে মুখ আড়াল করল সে।

—ভারী সুন্দর, তাই না? —বললাম আমি।

—আর শান্তির!

—তাইতো তোমার ঘুম পাচ্ছে!

—সত্যিই ঘুম পাচ্ছে— বড় বড় চোখ তুলে বলল বনশ্রী, দেখে মনে হলো সত্যিই ওর চোখ দুটি ঘুমে ভারী— কদিন রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি— যেভাবে তাকিয়েছিল সেভাবেই তাকিয়ে বলল সে— গতকাল রাত্রে তো একেবারেই নয়।

—কেন?

দৃষ্টি একটুও সরাল না সে, এমন কি পলকও ফেলল না, স্থির ভাবে বলল শুধু ভাবনা—

ধীরে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দূরে দৃষ্টি ভাসিয়ে দিলো, বলল— তারপর আজ যখন ভাবনার কথা বলতে পারলাম আমার সব ভাবনা কোথায় উধাও! তাই বোধহয় ঘুম পাচ্ছে।

একটু করে সময় যাচ্ছে আমাকে আরও একটু পূর্ণ করে দিচ্ছে বনশ্রী। আমি উপছে পড়ছি কাণায় কাণায়। নিজেকে বড় ধনী মনে হচ্ছে। আমাকে ভালবেসে এমন কষ্ট পেয়েছে এই মেয়ে আমি বুঝতেও পারিনি।

বনশ্রীর চুলে আমি আলতো হাত রাখলাম, বড়ো ভালবাসায় হাতে বুলিয়ে দিলাম। চোখ বুজিয়ে নিলো সে, মুখে তার পরম প্রশান্তি। আমার এরকম মনে হয়— এই আকাশ এই ভূমি, এই দিগন্ত প্রসারী শস্যক্ষেত্রে, এই প্রাচীন বৃক্ষ ও দেবতা, সমস্ত কিছুর সঙ্গে আমরা দু'জন মিলেমিশে একাকার বর্ণময় চিত্র এক অনন্তকালের গর্ভে স্থির হয়ে আছি।

তুমি যে দিয়েছ ফুল— এ শুধু উপহার নয়— এ যে গাঢ় প্রতিশ্রুতি বুকের ভিতর...

তুমি যে দিয়েছ ফুল— কত সাধে তার একান্ত আগ্রহে বড়ো হয়ে ওঠা! গাছ তাকে লালন করেছে, মাটি দিয়েছে রস, রৌদ্র ও বাতাস দিয়েছে জীবন— কত যুগ ধরে— সেই পৃথিবীতে যেদিন ফুলের প্রথম আবির্ভাব।

পৃথিবীতে কবে জন্মেছিল এই ফুল? কত কোটি বৎসর আগে? সেইদিন হতে তুমি জন্ম থেকে জন্মান্তর ফিরে ফিরে এলে, এই জন্মে আমাকে পূর্ণতা দিতে।

আমার মলিন ঘর ধূলোমাখা আলমারি, বই, ধূসর চেয়ার টেবিল, তক্তাপোষ, ম্লান মেঝে, সব কিছু আজ কি আশ্চর্য ঝলমল। আমার ঘরে দেখছি আজ আমিই নবাগত দর্শক নাকি অতিথি?

এই যে কারুকার্য করা সাদা কাপড়ে ঢাকা টেবিল একি আমার? এই যে টেবিলে ফুলদানি, রজনীগন্ধার গুচ্ছ এ কি আমার? এই যে তক্তাপোষে সৌখিন মাদুর, ঝকঝকে আলমারি ফিটফাট।

এসব কি আমার?

আমি সব সন্তর্পণে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখি। টেবিলের ওপর এই যে পাণ্ডুলিপি— হ্যাঁ এতো আমার! গতকাল অনেক রাত্রি অবধি জেগে থাকা স্বপ্নের ফসল।

গতকাল অনেকটা রাত্রি পর্যন্ত লিখেছিলাম। দীর্ঘদিন পড়ে থাকা যে লেখা আমি কাল সকালে কেটেকুটে শেষ করেছি কাল রাত্রে তাই বুকের ভেতর থেকে নেমে এলো প্রসন্ন ঝরণার মতো। এতদিনে আমি যে পেয়েছি—

আমি নিশ্চিত জানি গত রাত্রে বড়ো সুখে ঘুমিয়েছে বনশ্রী। সব কষ্টের ভাবনা বিসর্জন দিয়ে শান্তির ঘুম। সন্ধ্যায় আমরা যখন ফিরলাম ট্রেনে বসেই তার চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। ঘুম তাড়িয়ে চোখ তুলে একটু হাসি— পুনরায়—

হাওড়া স্টেশনের বাইরে এসে রজনীগন্ধা কিনল সে, তারপর দুজনে আলাদা। এখনও দেখা হয়নি। কখন যে সাজিয়ে গেছে ঘর।

কাল সন্ধ্যায় ফিরেই মনে হলো লিখতে বসি। একটা তাগিদ ভেতরে আমাকে অস্থির করছিল। মাকে খাবার ঢেকে রাখতে বলে নেমে এসেছিলাম। রাত্রে যখন এ ঘরে শিকল তুলে দিয়ে ওপরে গেলাম দেখি একটা বাজে। খুবই নিঃশব্দে ঠাণ্ডা খাবার খেতে হলো এবং খুবই নিঃশব্দে শোওয়া। সারাক্ষণ ভয় লাগছিল কখন বুঝি মায়ের ঘরের দরজা খুলে যায়।

শুয়েই ঘুম। গভীর ঘুম। অত রাত্রে শুয়েও ঘুম ভাঙল খুব সকালে।

কখনো সকালে ঘুম ভেঙে মনে হয় এক যুগ কেটে গেছে ঘুমের ভিতর... এক যুগ দীর্ঘ ঘুমে ঝরে গেছে সব ক্লান্তি সমস্ত জড়তা... এখন পাখীর মতো গাইতে হবে প্রকৃতির গান, উড়ে যেতে হবে, নির্মল বাতাসে ধুয়ে নিতে হবে শরীর, পালক...

আজ সকালে এমন এক অনুভব আমাকে বাইরে নিয়ে গিয়েছিল।

পাখী তার স্বচ্ছন্দ ডানায় উড়ে যায় মুক্ত আকাশে, আমার তো ডানা নেই, অনেক আকাশ পেতে আমি তাই হেঁটে হেঁটে চলে যাই নদীর কিনারে। ফেরীঘাট। নিঝুম। বাঁধা স্টীমার দুলে দুলে ঘুমায়। ছলাৎছল শব্দ করে নদী। আর কোন শব্দ নেই। একটানা হাওয়া। আকাশে জলজ মেঘ এখানে ওখানে। আমি দেখি বিশাল আকাশ, দেখি বিস্তৃত নদী বুক, নিঃশ্বাস নিই অঢেল বাতাসে।

একেবারে বাজার করে ফিরলাম। মুদীখানা দোকান থেকে একটা বড়ো ঠোঙা চেয়ে নিয়ে কিছু আজানপাতি আর একটা ডিম কিনলাম।

মা আমার কাজকর্মে কিছুই বলে না। আনাজপাতি তুলতে তুলতে শুধু বলল— হ্যাঁরে

বাইরের দরজা খুলে রেখে বেরিয়ে গেছিস আমাকে ডেকে বলে যাসনি কেন?

—আমি তো ভাল করে ভেজিয়ে দিয়ে গেছি।

—হয়তো হাওয়ায় খুলে গেছে। সকালে বনশ্রী হাঁফাতে হাঁফাতে ওপরে এলো। বলে কাল রাত্রে সে নিজে বন্ধ করেছে অথচ সকালে উঠে দেখে হাট খোলা। এসে পর্যন্ত ওরাই রোজ দরজা খোলা বন্ধ করে, আমাকে আর কষ্ট করে নামতে হয়না। বেচারী এমন ভয় পেয়ে গেছে। আমি তখন তোর ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে বললাম তুমি কিছু ভেবো না, বাউণ্ডুলে সাতসকালে বেড়াতে বেরিয়েছে।

—তুমি এইসব বললে?

—বললাম তো!

—বেশ করেছ, এখন চা দাও।

চা খেয়ে নীচে নেমেছি। শিকল নামিয়ে দরজা ঠেলতে এক নতুন ঘর আমাকে অভ্যর্থনা জানালো। কখনও কখনও নির্জীব পদার্থগুলি কি আশ্চর্য প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, এখন এই ঘরের প্রতিটি সামগ্রী এমনকি সুগন্ধী বাতাস পর্যন্ত আমার জীবন্ত মনে হলো। আমি সব কিছু ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখলাম, বুকভরে নিলাম সুগন্ধী বাতাসে....সঞ্চারিত হচ্ছিল কি এক শিহরণ।

অপেক্ষায় বেলা যায়। বনশ্রী আসে না। আমাকে এমন করে সাজিয়ে রেখে কোথায় গেল সে? আমি চুপচাপ বসে থাকি। রজনীগন্ধার গুচ্ছ বড়ো হতে হতে বৃক্ষের মতো মেলে যায় মাথার উপর... সুগন্ধ ঝরে পড়ে... ঘনিয়ে ওঠে সুগন্ধের মেঘ, ঘরে আবছা আঁধার...এবার কি সুগন্ধী বৃষ্টি নামবে? ভিজিয়ে দেবে।

—ঘর যে বৃষ্টিতে ভেসে গেল! —দ্রুত হাতে জানালা বন্ধ করে বনশ্রী, দুপদাপ শব্দ হয়, আমি চমকে উঠে দাঁড়াই।

সুইচ টিপে আলো জ্বালে সে। কোমরে জড়ানো রাঙা শাড়ীর আঁচল, এলো খোঁপা খুলে গেছে, চোখে ও কপালে শাসন ভ্রূকুটি।

কি যে ঘটে যায়— তীব্র বৃষ্টির শব্দ, মেঘের উল্লাস— আমি দু'হাত বাড়িয়ে তাকে বাহুর বাঁধনে টেনে নিই, গভীর আবেগে রাখি প্রথম চুম্বন...কেঁপে ওঠে বিশ্ব চরাচর, আকাশ কি ভেঙে খানখান? বৃষ্টি কি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সৃষ্টি?

অনন্তকালের কটি মূল্যবান মুহূর্ত বয়ে যায়, বনশ্রী ছটফট করে ওঠে, সরে যেতে চায়, আমি দিইনা, অপারগ সে আমারই বুকে মুখ ঘসে, হাঁফাতে হাঁফাতে বলে— পারিনা, এত সুখ নিতে পারিনা— তারপর শান্ত হয়ে যায়।

শিথিল হয়ে যাচ্ছে আমার বাহুবন্ধন। আমার বুকেও যেন হাপরের শব্দ। বনশ্রী ছুটে বেরিয়ে যায়।

...নিত্যদিন পেরিয়ে যাচ্ছি আলোকময় এক দীর্ঘ অলিন্দ। ঝনাৎঝন শব্দে খুলে যাচ্ছে

দরজার পর দরজা। পেরিয়ে চলে যাই, চলে যাই আরও গভীর থেকে গভীরে কোথায়...

আমি জানালা খুলে দিই। বৃষ্টি আসে। ভিজিয়ে দেয় মুখ গলা বুক, ভিজে যায় মেঝে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। হাওয়ার গতি ঘুরে যায়, বৃষ্টির ছাট সরে যায়, আচ্ছন্ন আমি ফিরে আসি।

হাওয়ায় ছড়িয়ে গেছে পাণ্ডুলিপি। আঃ! ত্রস্তে কুড়িয়ে নিয়ে একটি একটি পাতা গুছিয়ে তুলি— না ভেজেনি, এতদূরে আসতে পারেনি বৃষ্টির ঝাট।

নীচু হয়ে গোছাতে গোছাতে সহসা থমকে যাই, মনে হয় সমস্ত অনুভূতি একাগ্র করে আমি তো লিখতে চাই কিন্তু এই যে অনুভব নিত্য ছড়িয়ে পড়ছে চেতনায় এর এক সহস্রাংশও কি ফুটিয়ে তোলা যায় লেখনীর আগায়? যায় না, আমি বুঝতে পারি। নিজেকে কেমন অসহায় লাগে।

দিন গেল
সন্ধ্যা গেল
সন্ধ্যা রাত্রিও চলে গেছে
বনশ্রী এলো না।

আজ দুপুরের সঙ্গে বৈকাল, বৈকালের সঙ্গে সন্ধ্যার কোন তফাৎ নেই। সারাদিন যেন ঘন মেঘে আকাশ ঢাকা। সারাদিন অবিরাম বৃষ্টি। সারাদিন ঘরে আধো অন্ধকার।

রাত্রি বেড়ে যায়। আমি এখন কি করব? আমি লিখতে পারছি না, আমি ঘুমাতে পারছি না, আমি স্থির হতে পারছি না। কেন আমি এমন করলাম। এই দীর্ঘ অদর্শন কি কষ্টের! আগামী কালও যদি সে না আসে? কি করব আমি? তাকে দেখা সে যে কত সুখ। তার সঙ্গে কথা বলা সে যে কত আনন্দের! কারও সঙ্গে শুধুমাত্র কথা বলায় আনন্দ এ আমার ধারণার অতীত ছিল। আজ মনে হয় সব কথা যাকে বলা যায়, মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠ যার কাছে খুলে দেওয়া যায় সে—

জানো বনশ্রী, বাল্যকাল পর্যন্ত যতদূর ভাবতে পারি আমার কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু নেই। আমি নিজেই আমার নিজের সঙ্গী। আমার যত কথা বলা নিজের মনের সঙ্গে। আর ছিল সঙ্গী সাথী বৃক্ষলতা তৃণ, নদী ও আকাশ, প্রান্তর ও পাহাড়...আহা ভাবতে গেলে মনের মধ্যে এত সাথী ঠেলাঠেলি করে আসে— ভাঙা মন্দির, ঘাটের সিঁড়ি, খড় বোঝাই নৌকা, রেলব্রীজ, টেলিগ্রাফ স্তম্ভ সারি... সেই যে ভেলার মতো করে বাঁধা বাঁশের তাড়া গঙ্গায় ভাসিয়ে রাখা—

শোনো তাহলে আমার কৈশোরের কথা, আমাদের স্কুল গঙ্গার ধারে। দোতলার ক্লাশে জানালা দিয়ে দেখা যায় নদী। এক একদিন বিকালবেলা আমি স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে খেয়ে দেয়ে আবার চুপি চুপি চলে যেতাম স্কুলের ধারে। নিঝুম স্কুলের পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে গঙ্গার ঘাট...সেখানে নানান দেবতার ছোটখাট মন্দির সব, বট আর অশ্বত্থ গাছের জটলা—

এ সব পেরিয়ে জলের ধার। ওখানে অনেক বাঁশের গোলা আছে। কাঁচা বাঁশ তাড়া বেঁধে ভেলার মতো করে কোন দূরদেশ থেকে ভাসিয়ে আনা হতো কিনা কে জানে কিন্তু সেগুলি ঘাটের কাছে খোঁটা পুঁতে বেঁধে রাখা থাকতো। টলোমলো পায়ে কখনও বা হাতে পায়ে হেঁটে বাঁশের ওপর গিয়ে বসে থাকা হয়তো সেখানে আমার ডুব জল। চুপচাপ বসে বসে দেখতাম ঘোলা জল, দেখতাম নৌকা, স্টীমার। ওপারের বাড়িগুলি ছোট ছোট, ওদিকে দূরে কোন প্রাগৈহাসিক যুগের জন্তুর কঙ্কালের মতো হাওড়া ব্রীজ, তার পেটের ভেতর দিয়ে যায় সারি সারি পিঁপড়ের মতো যানবাহন। সবচেয়ে ভাল লাগত আমার খড় বোঝাই নৌকাগুলি। মনে হতো যদি ওই নৌকায় ওই খড়ের গাদার উপর বসে চলে যাওয়া যেত বহুদূর...বাতাসে নদীর গন্ধ পলিমাটির গন্ধ...

জানো বনশ্রী, আমিতো খেলার মাঠে যেতাম না। খেলতে যাবার বেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোনও দিন চলে যেতাম রেললাইনের দিকে। ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতাম। নীচু দিয়ে চলে গেছে কত লাইন। কত সব দূর দেশের দিকে, কত নিবিড় অরণ্যের মাঝখান দিয়ে, কত উঁচু পাহাড়ের পাশ দিয়ে— এসব ভাবতাম, ভাবতে ভাবতে আমি সেইসব ছবি চোখের সামনে দেখতাম।

কত যে ছোট ছোট ভাললাগা ছিল! বাড়ি থেকে অল্প দূরে মোড়ের কাছে ছিল একটা ছবি বাঁধানোর দোকান, ওখানে যে কতদিন বিকালে আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম। দোকানি ছিল হারুদা, কেমন ফ্রেমের কাঠ কেটে কোনাকুনি জুড়তো, তারপর মাপ মত কাচ কাটা, চুন দিয়ে পরিষ্কার করা, বোর্ড লাগান— সব সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেগুলি দেখতাম। বাঁধান হয়ে গেলে ছবিটা যখন সাজিয়ে রাখত হারুদা তখন ছবি দেখতাম। ঠাকুর দেবতার ছবির চেয়ে আমার বেশি ভাল লাগত ফটো। মানুষের ফটো নয় যতো সব অচেনা অজানা জায়গার ফটো, আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেগুলি দেখতাম...

আমার আর একটি প্রিয় জায়গা ছিল—ওই যে উঠোনের শেষে পাঁচিলের যে জায়গাটা দেখে মনে হয় আগে ওখানে একটা দরজা ছিল পরে যেটা গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে— ওখানে সত্যিই একটা দরজা ছিল। ওদিকে যে কয়টি বাড়ি দেখছ— ওখান ছিল বাগান। কাকা যখন সপরিবারের চাকুরিস্থল জলপাইগুড়িতে পাকাপাকি বসবাস শুরু করেন তখন ওই জায়গাটা বিক্রি করে সেই টাকায় সেখানে বাড়ি করে নেন।

ঠাকুর্দার সখের বাগান বাবার আমলে হয়েছিল জঙ্গল। বাগানের ভেতর যে পুকুর ছিল একমাত্র ওই পুকুরঘাট পর্যন্ত একটা পায়ে চলা সরু রাস্তা শুধু বেঁচে ছিল কারণ ওইটুকুই কেউ কেউ যাতায়াত করত, বাকি সারা বাগানে আর কোথাও কারো পা পড়ত না। বাল্যকাল থেকেই ওই বাগান আমাকে এমন টানত! আমি একপা দু'পা করে এগোতে এগোতে ক্রমশ সাহসী এবং এভাবে আমি একদিন দেখলাম সমস্ত বাগান আমার রাজত্ব।

বড় বড় কিছু আম জাম জামরুল বাতাবিলেবু বকুল আর ছাতিম এসব গাছ ছিল, বাকি

সবই ছোট গাছ। টগর যুঁই হাস্নুহানা গাছেরা নানা বাজে গাছের জঙ্গলের আড়ালে ফুল ফোটাত। আমি এ গাছের তলা দিয়ে ও ঝোপের ভেতর দিয়ে দিব্যি পথ করে নিয়েছিলাম। কাঠবিড়ালীর মতো আমি অতি দ্রুত সেসব পথ দিয় বাগান পরিক্রমা করতে পারতাম।

বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন সজ্জায় গাছপালা লতাপাতাগুলি আমাকে বিস্মিত করত, মুগ্ধ করত। কখনো নবীন পাতা কখনও ফুলের ভার কখনও বিচিত্র ফল তারা আমাকে দেখাতো। অনেক বুনো গাছও এমন আশ্চর্য সুন্দর সুন্দর ফুল ফোটাত!

সবচেয়ে প্রিয় ছিল বাগানের দক্ষিণের প্রান্তদেশ। ওখানটা এত নিশ্চুপ! চারদিক ঝোপে ঢাকা মধ্যিখানে একটু সবুজ ঘাসের কার্পেট। আমি ঝোপের ফাঁক দিয়ে ওখানে ঢুকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে পারতাম।

বাগানে পা দিলেই কেমন একটা শিরশির অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করত। সে অনুভূত আরও তীব্র হয়ে উঠত যখন আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে বা বসে থাকতাম। চার পাশে গাছেদের পাতা নড়ার শব্দ, কাঁপত ঘাসের শীষ, বোবা সবুজ প্রাণগুলি আমার সাথে নিঃশব্দে কথা বলত। এভাবে একদিন বয়ঃসন্ধিকালে...বসন্তের এক মদির দুপুর...আমবউলের মৃদুগন্ধের সাথে মিশেছে বাতাবীলেবু আর বেলগাছের ফুগগুলির তীব্র সুবাস। চেনা অচেনা কত ফুল চারপাশে আপন আপন সুগন্ধের বৃত্তে মাতোয়ারা। সুগন্ধে ভারী বাতাসে আমি যত ঘুরছিলাম তত তীব্র হয়ে উঠছিল অনুভব। নাভিস্থল থেকে এক আশ্চার্য শিহরণ ছড়িয়ে পড়ছিল সমস্ত শরীরে ....এবং এক সময় অবাক আমি অনুভব করলাম সমস্ত শিহরণ কেন্দ্রীভূত হয়েছে জননেন্দ্রিয়ের শীর্ষে। সেই নিভৃত নির্জনে নিজেকে নিয়ে খেলা করতে করতে আমি সেদিন প্রথম অনুভব করলাম বীর্য পতনের সুখ ....মঞ্জরিত গাছেরা আমার চারপাশে দুলে দুলে হাসাহাসি করছিল...

ইস! এসব একান্ত গোপন কথা কাউকে কি বলা যায়? এমন কি বনশ্রীকে? বোধহয় বলা যায়! বোধহয় কেন, নিশ্চিত বলা যায়! একমাত্র তাকেই বলা যায়... তেমন ঘনিষ্ঠ দিনে...

রাত হ'য়ে গেল, তুমি এলে না। নাই আসো, তাই বলে কি আমি একা? এইতো আমি বনশ্রীর সাথে গল্প করছি, থাকো তুমি ঘরের আড়ালে।

জানো বনশ্রী, ছেলেবেলায় মা সকলকে বলত— ও আমার শ্বশুর, ফিরে এসে জন্মেছে আমার পেটে, দেখছনা সারাদিন বাগানে ঘুর ঘুর করে!

হয়তো তাই। হয়তো এভাবেই মানুষ জন্মান্তরে ফিরে ফিরে আসে মাটির মায়ায়...

...এসো বনশ্রী, এসো আমার মায়ার বন্ধনে, আমার বুকের মধ্যে মুখ রাখো সুখে, আমি তোমার চুলে হাত বুলিয়ে দেবো, চুমা দেবো চোখের পাতায়...

...তুমিতো নিজেই দেবে সব, আমাকে ভাসাবে। তুমিতো এসেছ নিজে। আমার একান্ত দীর্ঘ বর্ষ পার হয়ে স্বপ্নের আঁধারে ছিল বিমর্ষ বিধুর। তুমি এলে— সে আঁধার ভেঙে স্বপ্ন

থেকে নেমে এলে। হয়তো এমনই হয়। ইচ্ছাশক্তি পৌঁছে দেয় কিংবা টেনে আনে প্রার্থিতর কাছে।

বনশ্রী, কাল তুমি এসো।

দিন যায়, তরঙ্গিত নদী, কল্লোলে কল্লোলে বয়ে যাওয়া দিন। দিন যায়, বৃষ্টিধারায় স্নাত বৃক্ষের দিন, সবুজ সজীব হয়ে পাতায় শাখায় বেড়ে ওঠা দিন...

আমি তোমাকে এক আশ্চর্য্য বৃক্ষের কাছে নিয়ে যাবো। সে বৃক্ষে আশ্চর্য্য ফুল, সে ফুলে আশ্চর্য্য গন্ধ, আমি তোমাকে সেই আশ্চর্য্য সুগন্ধের কাছে নিয়ে যাবো...

সে থাকে অচিন দেশে অচিন নদীর ধারে মাটি ও জলের সীমানায় ...আমি তোমাকে সেই অচিন নদীর দেশে নিয়ে যাবো...

কতদিন নদী তীরে সূর্যোদয় সূর্য্যাস্ত বেলায় দেখেছি জলের স্রোতে ভাসমান আলোর দীর্ঘপথ, সে পথে হেঁটেছি কতবার। শরৎ আকাশে দুধের ফেনার মতো মেঘে কতদিন সাঁতার কেটেছি। সে সব সুখের বেলা আরও বর্ণসমুজ্জ্বল আজ... আমি তোমাকে সেই আশ্চর্য বর্ণসমারোহে নিয়ে যাবো।

কত রৌদ্রতপ্ত দুপুর কত বৃষ্টিসিক্ত সন্ধ্যা কত জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি নিঃসঙ্গ ব্যাথায় কেটে গেছে, আজ সে বিদুর বেলা মধুময়...

সোনামুখী ধানশীষ নুয়ে পড়ে সম্পদের ভারে, আমি এক সোনামুখী ধানশীষ, পূর্ণপ্রাণ...

দিন যায়...

বৃক্ষ হননের শব্দ সারারাত ...ভূমিশয্যা নেয় বনস্থলী...আমার প্রিয় সেইসব গাছেরা— যাদের আমি ভালবেসে ছুঁয়েছি কতবার— তাদের মৃত্যু আর্তনাদ।

যে স্বচ্ছ নিষ্কলুষ জলে আমি কতকাল সাঁতার কেটেছি সেই পুষ্করিণী আবর্জনা স্তূপে

ভরে ওঠে, বিষিয়ে ওঠে জল, রূপোলী মাছেরা সমাধিস্থ...

চারপাশে বিষণ্ণ ধ্বংসস্তূপ, আমি হাঁটু মুড়ে বসি, দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদি...

স্বপ্নে কাল সারারাত এভাবেই অবিরাম অশ্রু নিঃসরণ।

কৈশোরে আমার সেই সুখময় খেলা... নিঝুম দুপুরে আমি নির্জন বাগানে ঘাটের রানায় খুলে রাখতাম সমস্ত পোষাক। তারপর জলে লাফ। স্নিগ্ধ স্বচ্ছ জল আমাকে জড়িয়ে নিত সমস্ত শরীরে। এক ডুবে কতদূর...এভাবে কতক্ষণ চলত খেলা। নুয়ে পড়া গাছেদের জল ছুঁই ছুঁই শাখা আমাকে ছোঁয়ার জন্য বাড়িয়ে দিত আদরের হাত, আমি জল ছুঁড়ে তাদের ভেজাতাম।

তারপর

একদিন আমাকে কাঁদতে হলো বধ্যভূমে...

এদৃশ্য কোথায় ছিল বুকের গভীরে, কালরাতে উঠে এলো স্বপ্নের ভিতর।

অতঃপর ক্লিষ্ট সকাল। নুনের আরকে ছিল সারারাত সমস্ত শরীর। কপালের দু'পাশ থেকে গড়িয়ে যাচ্ছে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা ঘাড়ের দিকে।

সকালে উঠেই স্নানঘরে গেলাম। দীর্ঘ সময় ধরে ধারাস্নান। ঠাণ্ডা জলস্রোত কিছু গ্লানি যদি ধুয়ে দেয়।

যখন সুখের মধ্যে থাকি মনে হয় জন্মাবধি সুখেই রয়েছি। ভুলে যাই, কিংবা হয়তো ভুলে থাকতে চাই। কিন্তু জালিয়াত সময় নিষ্কৃতি দেয়না। মাঝে মাঝে ঠিক উস্কে দেয় স্মৃতি। ক্ষতস্থানগুলি থেকে রক্ত ঝরে।

জালিয়াত সময় সব কর্জ নিয়ে নেয়। যদিও মানুষ আশায় আশায় স্মৃতি পুষে রাখে— হয়তো একদিন—

কিন্তু সময় কখনো ফিরিয়ে দেয় না, এভাবেই আশা নিয়ে—

ঠাণ্ডা জলস্রোত থেকে গড়িয়ে এলো ভয়, আমি কেঁপে উঠলাম, বনশ্রী— জীবনে এক আশ্চর্য্য উদ্যান, একদিন সে উদ্যান যদি—

জালিয়াত সময় তো মুখিয়ে আছে, সুযোগ পেলেই যদি থাবা দিয়ে ছিনিয়ে নেয়?

বাইরে মায়ের ডাকাডাকি। কতক্ষণ স্নান করছি আমি? একঘণ্টা?

বাইরে এসে বারান্দায় দাঁড়ালাম। ওই— একমাত্র সাক্ষী নিমগাছ এখনও বেঁচে। ও আমাকে মাঝে মাঝে পাঠিয়ে দেয় দু-একটি হলদে পাতা। ও কি আমাকে এখন দেখছে? বুঝতে পারছে ব্যথা? তাই বুঝি শাখা নেড়ে সান্ত্বনা জানায়?

ও বাড়ির মালিক কি দয়ায় ওকে নিধন করেনি! কিন্তু কিভাবে বেঁচে আছে? কোথা সেই উজ্জ্বলতা, সেই সজীবতা!

বনশ্রী— জীবনে এক আশ্চর্য্য উদ্যান। একদিন সে উদ্যান যদি—

পড়ে থাকবে মলিন কিছু স্মৃতিচিহ্ন...ধূসর শূন্য ফুলদানি...

...চারিদিকে শূন্য ফুলদানি। নানান গড়ন, নানা রঙ, ছোট বড়, কোনটি বা কি বিশাল—আমার মাথা ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে। কিন্তু সব শূন্য, এবং ধূলিধূসর। কোথাও এতটুকু পা ফেলার জায়গা নেই। আমি পা বাড়াতে গেলে পা লেগে গড়িয়ে যায় ফুলদানি, ভেঙে খানখান... চারদিকে ভাঙা কাচ, একটু পা ফেলার জায়গা নেই ...ক্ষত বিক্ষত পা, ক্ষত বিক্ষত শরীর...

এত ক্লান্তি। শীত জড়িয়ে ধরছে শরীরে। মাথা আঁচড়াতে হবে, পোষাক পরতে হবে, কিন্তু কিছুই করতে ইচ্ছে করছে না।

আসলে গতকাল স্মৃতি রোমন্থনে অমৃত আনন্দের আড়ালে কখন উঠে এসেছিল হলাহল, সেই বিষ অজান্তে কখন মিশে গেছে চেতনায়। অতঃপর ঘুমের মধ্যে বিষধর হানা দিয়ে যায়...

গতকাল আমি বনশ্রীকে 'বেণু' নামে ডেকেছিলাম, বলেছিলাম— বেণু, আমি তোমার ছোট্ট সুন্দর নামটি জেনে গেছি। এতদিন তুমি এমন মিষ্টি নাম আমার কাছে গোপন করে রেখেছিলে কেন?

গতকাল সকালের দিকে সারাক্ষণ ওদের ঘরে কে যেন খুব ভারী গলায় বেণু বেণু করে বারবার ডাকাডাকি করছিলেন, এটা ওটা ফরমাস করছিলেন। তাঁর গলা এতই গম্ভীর ও উদাত্ত যে সমস্ত বাড়িতেই শোনা যাচ্ছিল। বিকালে বেড়াতে বেরিয়ে এইসব কথা আমি বনশ্রীকে বললাম।

বেড়াতে বেরোনো এখন একটা সুখের অসুখের মতো রোজ যেন জ্বরের কাঁপুনি। তোমার জন্য রোজ মায়ের কাছে মিথ্যা কথা বলা! এমন পাপ করছি!' বনশ্রী মাঝে মাঝে বলে 'রোজই রিহার্সাল দিতে যাচ্ছি বলে বেরোই, সে নৃত্যনাট্য যে কবে কোথায় জিজ্ঞাসা করলে হয়েছে আর কি!

প্রেমের জন্য মিথ্যে কথা বললে পাপ হয় না— আমি তাকে সান্ত্বনা দিই।

বেড়াতে বেরিয়ে বসে গল্প করবার আমাদের প্রিয় একটি সুন্দর নির্জন জায়গা আছে। প্রথম যেদিন বনশ্রীর সঙ্গে বেরোই সেই প্রথম অভিসারের দিনে আমরা ময়দানে যেখানে বসে পরস্পরের কাছে এসেছিলাম। আজও আমরা সেদিকেই যাচ্ছিলাম।

সেই উদাত্ত কণ্ঠে অধিকারির কথা জিজ্ঞাসা করাতে বনশ্রী উচ্ছসিত, বলল উনি বাবার বন্ধু। আমার জেঠুমণি, এই প্রথম এ বাড়িতে এলেন, আগে আমাদের পাশের বাড়ি থাকতেন পরে বালিগঞ্জের ওদিকে চলে যান। আমাকে ছোট থেকে কি ভালই যে বাসেন! উনিই তো আমার নাচ শেখার প্রথম গুরু, আমাকে সেই খুব ছোটবেলায় নাচ শুরু করান। আমার বেণু নামটা ওঁরই দেওয়া।

এত কথা একসঙ্গে বলে একটু থামল বনশ্রী, একটু দম নিলো। তার মুখ চোখ লাগছিল আনন্দ উজ্জ্বল। একজন শ্রদ্ধেয় ভালোবাসার মানুষের কথা বলতে গিয়ে তার হৃদয় ভরে

উঠেছে অমৃতে।

রোমন্থনে অমৃত আনন্দের স্বাদ স্মৃতিকে আরও উজ্জীবিত করে, বনশ্রীর মনে আরও অনেক কথা ভীড় করে এলো, সে বলল— মানুষটা ওইরকম, হৈ হৈ করছেন সারাক্ষণ কিন্তু অতো জোরে কথা বললে কি হবে কাউকে কখনো একটু ধমক দিতেও পারেন না। কারোর অবাধ্যতায় শুধু করুণ চোখে তাকাবেন, এমন কষ্ট লাগে! মনে দাগ থেকে যায়!

বনশ্রীর মুখে গুণগান শুনতে শুনতে আমিও সেই না দেখা মানুষটিকে ভালবাসছিলাম, বললাম— এমন মানুষকে একবার দেখতে ইচ্ছে হয়।

—দেবো তোমার সাথে আলাপ করিয়ে— বলতে গিয়ে রক্তোচ্ছাস বনশ্রীর মুখে, সকালে খুব ইচ্ছা করছিল তোমার কাছে নিয়ে আসতে, কিন্তু—

বনশ্রীর এমন ব্যঞ্জনাময় কারুকার্যের মুখ আমাকে বড়ো তৃষিত করে, কিন্তু সংযত থাকতেই হয়, এই খোলা আকাশের নীচে এমন আলোয়— অতএব আমি শুধু দৃষ্টিসুখেই সন্তুষ্ট থাকলাম, বললাম, তোমার অবাধ্যতা আর ওনার ব্যথা পাওয়ার নিশ্চয় অনেক ঘটনা আছে?

—বারে! আমি বুঝি খুব অবাধ্য মেয়ে?

—আমি কি তাই বলেছি?

—বললে তো। কৌতুক ছলছল করল বনশ্রীর কণ্ঠস্বরে।

—মাত্র একবার অবাধ্যতা— বলল বনশ্রী— তাও আমার ছোটবেলার কথা, আমি তখন অল্পস্বল্প নাচ শিখেছি, জেঠুমণি আমাকে প্রায়ই ছোটখাটো অনুষ্ঠানে নিয়ে যেতেন। তখন আমার অভ্যাস ছিল সাত তাড়াতাড়ি মেকআপ নিয়ে ঘোরাঘুরি করা। মেকআপম্যান বাক্স খুলে গুছিয়ে বসতে না বসতে আমি তাগাদা দিতাম— দিননা আমাকে সাজিয়ে দিননা!

ছোটবেলার 'দিননা' বলতে গিয়ে বনশ্রী ছোট মেয়ের মতই হাসিখুশী, হাসতে হাসতে বলল, জেঠুমণি প্রায়ই বারণ করতেন— বেণু, মেকআপ নিয়ে চটি পায়ে ঘুরবে না, ভুলে যাবে।

—ভুলে যাবে মানে? ঠি বুঝতে পারলাম না— বললাম আমি।

—মানে চটি পরেই নাচতে নেমে যাবো আর কি! —বলল বনশ্রী। আমি জ্যেঠুমণির কথা শুনতাম না। ওঁকে এড়িয়ে ঠিকই পায়ের চটি পায়েই রাখতাম। অতক্ষণ খালি পায়ে ঘোরা যায় নাকি? তাছাড়া যদি হারিয়ে যায়? যদি কেউ নিয়ে নেয়— এইসব ভাবতাম। মঞ্চে যাওয়ার আগে অবশ্য খুলে রেখে ঢুকতাম।

কিন্তু ঠিক একদিন ভুল হয়ে গেল। অন্যমনস্ক ছিলাম হয়তো, তাছাড়া এমনিতেই একটা উত্তেজনা থাকে! ঢুকে পড়ে বুঝতে পারলাম ভুল হয়ে গেছে কোন রকমে বেরিয়ে এলাম। জ্যেঠুমণি উইংস এ দাঁড়িয়ে ছিলেন, স্বল্প আলোকেও আমি দেখলাম তাঁর ব্যথাতুর

দৃষ্টি। সেই শেষ। তারপর থেকে চটি খুলে তবে ‘মেকআপ’ নিতে বসি, আর অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত খালি পায়েই থাকি। বনশ্রী চুপ করল।

কেমন এক সুখময় ব্যথার হাওয়া আমাকে ঘিরে। চুপচাপ কিছুক্ষণ কেটে গেল। একসময় আমি বললাম— খুব সুন্দর ঘটনা।

বেণু নাম শোনার পর সকাল থেকে আরেকটি বিস্মৃত নাম আমার মনের আনাচে কানাচে ঘোরাঘুরি করছিল, সেটা আমার একটা ডাকনাম। সে নামে ছেলেবেলায় মা আমাকে মাঝে মাঝে ডাকত। এখন আর মা আমাকে সে নামে ডাকেনা। আসলে সে নামের পরিবেশটাই এখন আর নেই। আমার সে নামটি হলো বুনো।

হাঁটতে হাঁটতে প্রিয় স্থানে আমরা পৌঁছে গেলাম, এবার বসার তোড়জোড়। সহসা বনশ্রী হাত তুলে দেখাল এক আশ্চর্য দৃশ্য। যে রাস্তাটা ফোর্ট উইলিয়মের ভেতর চলে গেছে তার ডানদিকে দূরে কাশফুলের মহা সমারোহ।

আমরা মেঠো রাস্তা ধরে পায়ে পায়ে এগিয়ে চললাম। একদল ছেলে ফুটবল খেলছে, একটা জলের ঠেলাগাড়ি, তাদের পাশ দিয়ে রাস্তাটা উঁচুর দিকে উঠে বাঁক নিয়ে চলে গেছে সম্ভবত গঙ্গার দিকে।

তারপর আমাদের সামনে অল্পস্বল্প জল থৈ থৈ আর অজস্র কাশফুলের উচ্ছ্বাস। পেছনে দুর্গপ্রাকারের গাছগাছালি কথা বলাবলি করছিল। আমরা সুখের বনে ডুব দিয়ে বসলাম।

আমি যখন ভাবনার গভীরে চলে যাই বনশ্রী আমাকে ডাকেও না, কথাও বলে না, কেন জানিনা। সহসা ফিরে দেখি সে একমনে দেখছে আমার মুখ। ঠিক এমন মুহূর্তে বুকের মধ্যে কেমন ছলাৎছল শব্দ হয়ে যায়...জানো বেণু— বললাম আমি— তোমার এই নামের অক্ষর দুটো দিয়ে আমারও ছোটবেলায় একটা নাম ছিল, মা আমাকে সেই নামে ডাকতেন সে নাম হলো ‘বুনো’।

শুনে বনশ্রী একটুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে তারপর খিলখিলিয়ে হেসে উঠল, আবার হঠাৎই হাসি থামিয়ে চুপ, বলল— রাগ কোরোনা!

—রাগের কি আছে?

—বারে! এই যে আমি হাসলাম!

—আমাদের বাড়ির পেছনে একটা মস্তো বাগান ছিল,— আমি আমার স্মৃতিতে— অবহেলায় সেটা জঙ্গল হয়ে যায়, জঙ্গল হয়ে সেটা কিন্তু আরও সুন্দর হয়ে ওঠে—

স্মৃতি রোমন্থনে উঠে আসে অমৃত আনন্দ... ফুল ফোটার কি কোন শব্দ নেই? আছে। বাতাসের সেই স্তরে নিয়ে যেতে হবে শ্রবণ... সেই সব সবুজ বর্ণময় দিনের কথা আমি যে কি বললাম আমি জানি না, এক সুখময় আনন্দের শিহরণ আমাকে জড়িয়ে ছিল সারাক্ষণ! পরিশেষে বললাম সেইসব দিনে মা আমাকে বুনো বলে ডাকতেন।

বল খেলা শেষ হয়েছিল, খেলোয়াড় ছেলেরা গোল হয়ে বসে গল্প করছে, দূর থেকে কেমন ছোট ছোট দেখাচ্ছে ওদের। জলের ঠেলাগাড়িটা একজন ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল— ছোট্ট একটা দেশলাই বাক্স যেন ছোট্ট একটা পুতুল ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। ওপাশে আরও দূরে গাছেদের মাথা থেকে মুছে যাচ্ছে শেষ রোদ্দুর, আকাশের নীল রঙে সূক্ষ্ম লালচে আভা।

—এই বাড়ির পিছনে বাগান ছিল? —বনশ্রী জিজ্ঞাসা করল।

—হ্যাঁ, অনেকদিন আগে ওটা টুকরো টুকরো ভাগে বিক্রি হয়ে সব বাড়ি হয়ে গেছে।

আমরা উঠলাম, হাঁটতে হাটতে আমরা নদীর দিকে, আমি বুঝতে পারছিলাম আমাকে ঘিরে ধরেছে বিষাদচ্ছন্ন অন্ধকার।

—ভিজে গায়ে এখনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছিস? —মায়ের ধমকানি। তাইতো, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি! ঘরে গেলাম। ভাল লাগছেনা তবু পোষাক পরতে হবে। ভাল লাগছে না তবু চা খেতে হবে। ভাল লাগছেনা তবু বাজারে যেতে হবে।

ব্যাগ হাতে বাড়ি থেকে বেরিয়েই দেখলাম—

রোজ সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমার প্রথমেই সাক্ষাৎ হয় কিছু ঘাসেদের সাথে। আমাদের বাড়ির পাঁচিলের পাদদেশ যেখানে বাঁধানো রাস্তার সাথে সমকোণ সেখানে কিভাবে যে জমে যায় মাটি! সে মাটিতে দীর্ঘ পাঁচিলের ধার ঘেঁসে বরাবর বসবাস করে কিছু ঘাস। ইদানিং বর্ষার জলে সেগুলি হয়ে উঠেছিল খুবই স্বাস্থ্যবান। রোজই আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওদের দেখি, যে দু'একটি সাহসী লকলকে ডগা একটু এগিয়ে গেছে রাস্তার দিকে, তাদের তারিফ করি। বহুকাল আগে তাদের পূর্বপুরুষের যে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল সে কথাও স্মরণ করতে বলি।

আজ বেরিয়ে দেখলাম সব সাফ। চেঁচে ছুলে পরিষ্কার। মাটি মাখা ছিন্নভিন্ন সবুজ ঘাসেরা স্তূপীকৃত পড়ে আছে রাস্তার ধারে। বুকটা মুচড়ে উঠল!

একগাল হেসে সামনে এসে দাঁড়াল ঝাড়ুদার, বলল, সব সাফ করে দিয়েছি বাবু, বর্ষার জল পেয়ে এমন বেড়েছিল জঞ্জাল!

আমি হনহনিয়ে হাঁটতে শুরু করে দিই। এখনই হয়তো জল্লাদ বকশিস চাইবে। কাজের লোক সাফ করেছে সতেজ প্রাণগুলি। ওরা কি দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল? নাকি অস্বাস্থ্যকর জীবাণু?

কিছুই ভাল লাগছে না। বিমর্ষ মন নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি আরও বেশি বিমর্ষ পথে পা দিলাম। অবাধ আনন্দের মধ্যে কাটাছিল দিনগুলি, সহসা কাল রাত্রি থেকে এক দুঃস্থ আবহাওয়া আমাকে ঘিরে ধরছে। শঙ্কিত আমি ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাচ্ছি।

বিষণ্ণ মনে বাজারের পথে হাঁটতে লাগলাম। সহসা মনে পড়ল আজকের দুপুরের কথা— আজ দুপুরে আমি বনশ্রীকে নিয়ে কলেজ স্ট্রিট যাবো। কয়েকদিন আগে এক প্রকাশকের কাছ থেকে চিঠি এসেছে— মনে পড়তে মনটা একটু ভালো হয়ে গেল।

চিঠিটার আবিষ্কারক বনশ্রী নিজেই। দুপুরবেলা চিঠিটা দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে ঘরে ঢুকল, বলল একটা চিঠি আছে।

—কার? —আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—লেখকের— বলেই সে খামটা ছিঁড়তে আরম্ভ করল।

—অপরের চিঠি বিনা অনুমতিতে পড়া অন্যায় কিন্তু...আমি ঠাট্টার স্বরে বললাম।

বনশ্রী কিন্তু গম্ভীর, বলল— ও! আমি বুঝি পর?

—কি মুশকিল! আমি তাই বললাম?

—বললে তো! শুধু পর নয়, তুমি বললে 'অপর' মানে পরের থেকেও দূর!

এরকম মানে করে বনশ্রী চিঠিটা খুলে ফেলল, আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল আমি পড়ছিলাম না শুধু খুলে এগিয়ে দিলাম, মানে সেক্রেটারির কাজ করলাম।

আমি ওটা হাতে ধরলাম না, বললাম তুমিই পড়।

—উঁ হু!

—তাহলে কিন্তু—

—ঠিক আছে ঠিক আছে পড়ছি— কাগজের ভাঁজ খুলল বনশ্রী, চিঠি পড়ার জন্য ও ভেতরে ভেতরে ছটফট করছে আমি বুঝতে পারলাম।

মহাশয়, যে ইংরাজি উপন্যাসের অনুবাদটি আপনার কাছ থেকে নিয়েছিলাম ওটি আমি পুস্তক আকারে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক। অনুবাদটি খুবই ভাল হয়েছে। এ ব্যাপারে এবং আরও দু-একটি বইয়ের অনুবাদের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে মুখোমুখি কিছু কথাবার্তা বলা প্রয়োজন। যে কোনদিন দুপুরের পরে যদি আমার এখানে আসেন অত্যন্ত বাধিত হবো। নমস্কারান্তে বিনীত সদানন্দ ঘোষাল।

—এক নিঃশ্বাসে চিঠি শেষ করে বনশ্রী থামল।

চিঠি শুনতে শুনতে আমি আনন্দে উৎফুল্ল, বললাম— জানো, বেশ কিছুদিন আগে একটি ইংরজি উপন্যাস আমি অনুবাদ করেছিলাম। আসলে বইটা আমার এত ভাল লেগেছিল! আমি যেন লেখকের সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনাগুলি নিজের মতো করে অনুভব করছিলাম। লেখাটি আমি নিজের ভাষায় সাজিয়ে তুলি। দিন রাত্রি প্রায় একটানা কাজ করে খুব অল্প দিনেই কাজটা শেষ করেছিলাম। একদিন একটা পত্রিকার অফিসে পত্রিকার সম্পাদক ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। কথায় কথায় অনুবাদটি কথা শুনে উনি সেটা পড়তে চাইলেন। দিয়েছিলাম, তারপর অনেকদিন হয়েও গেছে। শেষে বললাম— এই বইটা আমি তোমাকে উপহার দেবো!

দু'পাশে মাথা দোলালো বনশ্রী, অর্থাৎ— না। বলল, ওসব নকল অনুবাদ আমার চাই না, আমার চাই আসল। যে উপন্যাসটা লিখে লিখে লুকিয়ে রাখা হচ্ছে ওটা আমাকে দিতে হবে। তারপর অনুরোধের গলায় বলল যেদিন যাবে আমাকে ওখানে নিয়ে যাবে? আমার

খুব ইচ্ছা করছে।

—বেশতো, যাবে।

—খুব ভাল হবে, —বলল বনশ্রী— বাবা পূজোর শাড়ি কেনার টাকা দিয়েছে, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট থেকে শাড়ি কিনব, তুমি পছন্দ করে দেবে।

কথা আছে আজ দুপুরে যাবো। বড়ো বড়ো পায়ে আমি বাজারের দিকে এগিয়ে গেলাম।

আজ প্রথম বেণু ও আমি একসঙ্গে বাড়ি থেকে বেরোলাম। অর্থাৎ কিনা আমাদের এই বেরোনো সকলের অনুমোদিত।

যোগাযোগটা ঘটেছে অদ্ভুত ভাবে। মা আমাকে বলে রেখেছিল যেদিন কলেজ স্ট্রীট যাবি আমাকে বলিস, একটা বই কিনে আনতে হবে।

—তোমার আবার কি বই? —আমি অবাক।

—একটা রান্নার বই।

শুনে আমি আরও অবাক তোমার রান্নার বই?

—আমার নয় নীচে— খুকুর মায়ের। তুই মাঝে মাঝে কলেজ স্ট্রীট যাস শুনে বলছিল কি একটা রান্নার বই কাগজে দেখেছে ওটা যদি কিনে এনে দিস্।

চিঠিটা আসবার পর আমি মাকে বললাম দু'একদিনের মধ্যে কলেজ স্ট্রীট যাবো, কি তোমার রান্নার বই বলো। ব্যাপারটা কি হলো জানিনা, মা নীচের থেকে ঘুরে এসে বলল— হ্যাঁরে, খুকু কলেজ স্ট্রীট যাবে পুজোর কাপড় কিনতে, তোর সঙ্গে যাক্‌না? রান্নার বইয়ের শখ খুকুরই ও নিজেই দেখে শুনে নেবেখন।

অতএব আজ আমরা দু'জন একসঙ্গে বাড়ি থেকে বেরোলাম। বনশ্রীর অবস্থা দেখবার মতো, গায়ে আঁচল জড়িয়ে যেন জুজুবুড়ি, কপালে আর ঠোঁটের ওপর ঘামের সারিসারি বিন্দু— এমন রূপে সে যখন সামনে এসে দাঁড়াল তখন কি সুখ। কি সুখ! আমি চুপিচুপি ডাকলাম— খুকুমণি। তখন চোখে তার কি অপরূপ ভঙ্গী!

—এই যে দৃষ্টি প্রক্ষেপণ এটা ভরত নাট্যমের কোন মুদ্রা? আরও চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম আমি। সে আমাকে চোখের ভঙ্গিমায় আরও শাসালো।

মায়ের স্নেহসিক্ত দৃষ্টির সামনে দিয়ে আমরা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। কি জড়তা জড়িয়ে ধরছে বনশ্রীর পায়ে! আমরা সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম, আমি আগে বনশ্রী পিছনে। ছায়া ছায়া সিঁড়ির শেষ ধাপে পা দিয়ে সহসা আমার মনে সকালের সেই বিষণ্ণতা, বনশ্রী কোথায়? —ভাবলাম আমি, ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখতে চাইলাম— আমার সবুজ বনবীথিকা—

...দুলে ওঠে সিঁড়ি, দুলে ওঠে পৃথিবী, দোলে আকাশ— না, দুলে দুলে আকাশে ভেসে যায় কালো এক কেটে যাওয়া ঘুড়ি...অবলম্বনহীন ছেঁড়া সুতো লটপট চিলেকোঠার ছাদ

ছুঁয়ে ওই পুনরায় শূন্যে দোদুল্যমান—আমি হাত বাড়িয়ে ধরতে চাই সুতোর খুঁট, ফসকে যায়, ফসকে যায় পায়ের নীচে অবলম্বন— আমি পড়ে যাচ্ছি—

পাশে এসে দাঁড়ায় বনশ্রী, আমি তৃষিতের মতো দেখি জল, বনশ্রী চুপি চুপি বলে — কি?

—কিছু না— দীর্ঘশ্বাসে বলি আমি।

ট্রাম থেকে নেমে বনশ্রী জিজ্ঞাসা করল আগে কি কেনাকাটা করব, না— তারপর কি ভেবে নিজেই বলল— আমার মনে হয় আগে দেখা সাক্ষাৎ সেরে নেওয়া ভাল।

—তাই হোক— বললাম আমি।

—কি কথাবার্তা হবে?

—কিছু টাকাকড়ির ব্যাপার বোধহয়— এসব কথাবার্তা আমি মোটেই বলতে পারি না, কেমন অস্বস্তিকর।

—আমাকে সেক্রেটারী রাখ, আমি তোমার হয়ে কথাবার্তা বলব।

—ঠাট্টা নয়, তুমি যদি পারো আমি বেঁচে যাই, এইতো কি বলব না বলব ভেবে এখনই আমার কিরকম যেন হচ্ছে।

বনশ্রী কুলকুলিয়ে হেসে উঠল।

সদানন্দ বাবুর দোকান বেশ জমজমাট। কাউন্টারে বেশ কয়েকজন ক্রেতা। চারপাশে ঝকঝকে সব নতুন বই ঠাসা র‍্যাকগুলি পার হয়ে আমরা ভেতরে এলাম। চাপা গলায় বনশ্রীকে জানালাম সদানন্দবাবু বেশ জাঁদরেল চেহারার লোক, অতএব—

ছোট্ট জায়গায় কয়েকটি চেয়ার ঘিরে একটা টেবিল। সদানন্দবাবু একটা খাতায় মনোযোগ দিয়ে কি যেন দেখছিলেন, আমাদের আভাসে মুখ তুলে চাইলেন, বললেন— আরে আসুন আসুন, বসুন— হাত বাড়িয়ে সামনের চেয়ার দেখালেন। বনশ্রীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে আমি হঠাৎ একটুও ইতঃস্ততঃ না করে বললাম বউ।

দু'হাত তুলে নমস্কার জানালেন সদানন্দবাবু, সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে আরেকবার বনশ্রীকে দেখলাম, হয় তো সাদা সিঁথি দেখলেন। মোটেই বউ বউ মনে হচ্ছে না তো! কি আছে! —আমি ভাবলাম— এখন অনেকে সিঁদুর পরেও না।

বনশ্রীও দেখছি অবিচল গাম্ভীর্য নিয়ে যেভাবে চেয়ারে বসল! এখন ওর ব্যক্তিত্বময় সৌন্দর্য দেখবার মতো! এরকমটি ওকে আগে দেখিনি। ঠিক দেখিনি বললে ভুল হয় একদিন সামান্য একটু আভাস পেয়েছিলাম নৃত্যনাট্যের সেই অনুষ্ঠানের পর যখন পরিচিত অনেকে ওকে প্রশস্তি জানাচ্ছিল সেদিন ওর সামান্য হাসি হাত নাড়া— এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে দেখেছিলাম ব্যক্তিত্বের প্রকাশ।

কাঁচাপাকা ওল্টানো চুলে ভারী মুখ সদানন্দর। আদ্দির পাঞ্জাবীর ভেতর থেকে ফুটে

বেরুচ্ছে ফর্সা রঙ। দু'হাতের আঙুলে পাঁচটা পাথর বসানো আঙটি। চেয়ারে হেলান দিয়ে একটু এলিয়ে বসলেন, বললেন— একটু চা খাওয়া যাক।

—না না— আমি বলতে গেলাম।

—তা কি হয়— ওরে নিমাই— একটু উঁচু গলায় ডাকলেন তিনি এবং আমাদের পেছনে দরজায় যে এসে দাঁড়াল তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন ভাল করে চা তৈরি করিয়ে আন্ আর গরম ভেজিটেবল চপ আনবি। হ্যাঁ, বলছিলাম কি— সদানন্দ পর্য্যায়ক্রমে আমার ও বনশ্রী দিকে তাকালেন— আপনার অনুবাদ পড়লাম, ভালো, খুবই ভালো এতো স্বাভাবিক আর স্বচ্ছন্দ মনেই হচ্ছিল না অনুবাদ পড়ছি, সত্যি কথা বলতে কি বুঝলেন অনেক অনুবাদক পেতে পারি কিন্তু তাঁরা তো সাহিত্যিক নন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমন একটা অবস্থা হয় সেই স্কুলের রচনার মতো। অবশ্য ভালো অনুবাদক যে নেই তা নয়—

সদানন্দবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, পাশের স্টীল আলমারি খুলে পাণ্ডুলিপি বার করে টেবিলে রাখলেন, আবার চেয়ারে বসলেন। আমি সযত্নে সেটি তুলে নিলাম, বনশ্রীর দিকে এগিয়ে দিলাম।

—এটা আমি ছাপবো, বুঝলেন— সদানন্দ বললেন, তবে কিনা দেখুন আরও একটা কথা আছে, এটা ইংরাজি সাহিত্যের একটি বিখ্যাত উপন্যাস। কিন্তু যদিও এটা বিখ্যাত বই তবু কতজন আর এ অনুবাদ আগ্রহ করে কিনবে বলুন? অবশ্য কিছু উচ্চ স্তরের পাঠক নিশ্চয় কিনবে, কিন্তু তাতে ব্যবসায়িক সাফল্য খুব কম। একটু হাসলেন সদানন্দ, যেন তাঁর কথার সমর্থন চাইলেন।

চা এসে গিয়েছে, কাগজের ঠোঙায় চপ এগিয়ে দিল ছেলেটি, ভাঁড়ে চা ঢেলে দিলো।

—এখানে ম্যাডাম এর চেয়ে সুব্যবস্থা আর কিছু করতে পারলাম না, এজন্য সত্যিই আমি দুঃখিত— বললেন সদানন্দ, চেয়ার ছেড়ে উঠলেন— কিছু মনে করবেন না, নিন দয়া করে নিন, আমি একটু আসছি— বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন।

বনশ্রী গাম্ভীর্য ছেড়ে সহজ হলো, পাণ্ডুলিপি টেবিলে নামিয়ে রেখে ঠোঙা থেকে চপ বার করে কামড় দিলো।

—কথাবার্তার এতসব ভনিতা কেন ঠিক বুঝতে পারছিনা— চুপি চুপি বললাম আমি। উত্তরে বনশ্রী কিছুই বলল না শুধু চোখের ইশারায় কিছু দেখাল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আমি দেখলাম ষ্টীল আলমারির মাথার ওপর পাশাপাশি বসানো গণেশ ও লক্ষ্মীর মূর্ত্তি।

—ব্যবসাটা যদিও সরস্বতীর আসল আরাধনা তো লক্ষ্মী আর গণেশের— চুপি চুপি বলল বনশ্রী,— মনে হচ্ছে টাকা পয়সার ব্যাপারে একদম— শক্ত মুঠো দেখিয়ে বনশ্রী একটা ভঙ্গী করল।

—টাকা আমি এখন চাইছি নাকি! —বললাম আমি।

— কি জানি, আমি এসবের কিবা বুঝি! বনশ্রী বলল। আমার ভেতর অস্বস্তির ভাবটা

বেড়ে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল পালিয়ে যাই, তবু কোনক্রমে বসে চায়ে চুমুক দিলাম।

সদানন্দ ফিরলেন, হতে দুখানা পেকারব্যাক ইংরাজী বই। বই দুখানা টেবিলে রেখে বসলেন তিনি, বললেন— এখন বাজারে হট কেকের মতো বিক্রি হচ্ছে এইসব বইয়ের অনুবাদ। অলিতে গলিতে ছুটকো কত যে প্রকাশনা নামে বেনামে এইসব বইয়ের অনুবাদ ছেপে লাল হয়ে যাচ্ছে কি বলব— বই দুখানা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন সদানন্দ, আমি একবার দেখেই রেখে দিলাম— রোমহর্ষক বই।

বনশ্রী বই দুটি তুলে নিয়েছে। সাধারণতঃ এসব বইয়ের মলাটে অর্দ্ধনগ্ন নারীর ছবি থাকেই, সদানন্দ সম্ভবতঃ বেছে নিয়ে এসেছেন, কেননা এ বই দুটিতে অন্তত সে রকম ছবি ছিল না, যদিও রিভলভার মদের পাত্র এসব ছিল।

—আপনি যে দুরুহ কাজ করেছেন তার তুলনায় এসব বইয়ের অনুবাদ করা আপনার বাঁ হাতের কাজ— বললেন সদানন্দ— আমার অনুরোধ আপনি আমাকে আপাততঃ এই দুটি বইয়ের অনুবাদ করে দিন। এই বইয়ের আয় আমার ওই বইয়ের ঘাটতি পুষিয়ে দেবে।

....পিচুটি আবদ্ধ চোখ মানুষের ভগ্নাবশেষ, নিম্নাঙ্গ নেই, গড়িয়ে গড়িয়ে দু'হাতে আলগায় বিষ আবর্জনা...সমস্ত শরীর ফেটে গড়িয়ে পড়ে পচা রক্ত, কিছু শুষে নেয় মাটি কিছু যায় নদী ও সমুদ্রের দিকে, পচে ওঠে পৃথিবীর তিন ভাগ জলজ প্রাণীর যত মাংস ও কঙ্কাল...বিষ বাষ্প ছড়িয়ে পড়ে বায়ুমণ্ডলে, নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো বাতাসও নেই, বিষাক্ত আকাশ ঝাপসা...

অবশ্য আপনার যদি অসুবিধা থাকে এসব বইতে নিজের নাম অনুবাদ হিসেবে ছাপতে নাও পারেন। যা হোক ছদ্মনাম দিয়ে দিলেই হবে —বললেন সদানন্দ— না কি বলুন ম্যাডাম? টাকারতো দরকার আছে! আপনাদেরও আছে আমাদেরও আছে। কি বলব বলুন, ইচ্ছা তো হয় ভাল ভাল বই ছাপি কিন্তু— ওইতো দোকানে গিয়ে দেখুন না। আমি তো শুধু প্রকাশক নই বই বিক্রেতাও বটে। যতো সব অফিস ক্লাব লাইব্রেরীর বই কেনার তালিকায় একবার চোখ বুলিয়ে নিন, চমকে উঠবেন। সদানন্দ উঠলেন, স্ট্রীল আলমারি খুলে চেক বই বার করলেন— আপাততঃ আমি হাজারখানেক টাকার একটা চেক দিচ্ছি— টেবিলে এসে বসলেন— পরে আবার— আমি জানি আপনি ইচ্ছা করলে অল্প দিনের মধ্যেই কাজটা করে ফেলতে পারবেন। —চেকটা লিখে ফেললেন সদানন্দ— আপনিই নিন্ ঘরের লক্ষ্মী— বনশ্রীর দিকে চেকটা এগিয়ে দিলেন।

হাত বাড়িয়ে চেকটা নিল বনশ্রী, বলল— আপনি ওর একটা উপন্যাস ছাপুন না।

—হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয় ছাপবো। এই বইয়ের কাজগুলো মিটে যাক। ওঁর বই ছাপবো না? আমি জানি একদিন উনি খুব নাম করবেন। আমি এ লাইনে আছি পঁচিশটি বছর, প্রতিভা চিনতে আমার ভুল হয় না। বুঝলেন।

তৃপ্তির হাসি বনশ্রীর মুখে— আমার একটা রান্নার বই দরকার— চেকটা রিভলবার ও

মদের পাত্রের খাপে রাখতে রাখতে বলল সে— এখানে পাওয়া যাবে?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়! লেখক মাত্রই খেতে ভালবাসেন, বুঝলেন, আপনি ভাল ভাল মুখরোচক খাবার তৈরি করে দেবেন আর আমার কাজ হু হু করে এগিয়ে যাবে— ঘর কাটিয় হাসতে হাসতে উঠলেন সদানন্দ— আমি দিচ্ছি আপনাকে, সবচেয়ে ভাল বই— বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন।

—ওঠ, —বললাম আমি।

বনশ্রী উঠল, বই দুখানা হাতে নিলো, লম্বা চেকটা বই ছাপিয়ে বেরিয়ে আছে।

আমি চিৎকার করে বলতে চাইলাম— বনশ্রী, ওগুলো নিও না, ওগুলো ফেলে দাও, কিন্তু কিছুই বলতে পারলাম না। বনশ্রী তার ব্যাগের চেন টানলো ওগুলো ভেতরে রাখল, চেন টেনে ব্যাগ বন্ধ করল।

সদানন্দ ফিরে এসেছেন, কাগজে মোড়া বই বনশ্রীর দিকে এগিয়ে দিলেন।

—কত দাম? —বনশ্রী জিজ্ঞাসা করল।

—ও আপনাকে সামান্য উপহার, হাসলেন সদানন্দ, —আমার এখানে প্রথম এলেন!

বনশ্রী খুব খুশী, আমার দিকে আনন্দিত মুখ তুলে বলল— চলো।

প্রিয় অনুবাদ পড়ে থাকে নোংরা টেবিলে আমরা বেরিয়ে আসি।

...কে শিকারী সুনিপুন হাতে ছুঁড়ে দেয় ফাঁস? কার হাত ধরে আছে সে রজ্জুর শেষ প্রান্ত? বিষাক্ত ধোঁয়ার মধ্যে সে আমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যায়...জ্বলে যায় চোখ, জ্বলে যায় বুক...টলমল হাঁটি আমি...ধোঁয়ার আড়াল থেকে শিকারীর অট্টহাসি কাঁপিয়ে দিচ্ছে সমস্ত পৃথিবী...

—কি হলো? কি হলো তোমার? —বনশ্রী আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছিল, একটা ষ্টেটবাস গাঁক গাঁক করে ছুটে যাচ্ছে— আমি সরে এলাম।

—কি হলো? —আবার বনশ্রীর প্রশ্ন।

—কিছু না —বললাম আমি।

রাস্তা পেরোতে হবে তো? —বনশ্রী অবাক গলায় প্রশ্ন করল। অনুসন্ধিৎসু চোখে সে আমার মুখের দিকে চেয়ে কি যেন বুঝতে চাইছিল।

আমরা রাস্তা পেরোলাম। সামনে বিখ্যাত শাড়ীর দোকান। বিক্রেতা অনেক হাসি নিয়ে আমাদের স্বাগত জানাল।

দেখতে দেখতে কাউন্টারে শাড়ী স্তূপাকার। বিক্রেতা একের পর এক ভাঁজ খুলে খুলে মেলে ধরছিল বিচিত্র সম্ভার। মুখ তুলে আমার মুখের দিকে চেয়ে বনশ্রী বলল— তুমি পছন্দ করে দেবে কিন্তু!

আমি এটা ছুঁলাম, ওটা ছুঁলাম। কি করব কিছুই ঠিক করতে পারছিলাম না। মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা। আমার কি জ্বর আসছে? সমস্ত শরীর জ্বালা করছিল।

হলুদ জমি আর সোনালী পাড়ের একটি শাড়ী খুলে ছড়িয়ে দিল কাউন্টারের লোকটি, বলল— এটা নিতে পারেন, সাউথ ইন্ডিয়ান সিল্ক খুবই সুন্দর, তাই না?

অসহায় আমি মাথা নাড়লাম।

—সত্যি সুন্দর, হলুদ জমিতে কি যেন মমতায় হাত বোলাতে বোলাতে বনশ্রী বলল— কত দাম? —কাগজের টুকরোয় লেখা দাম দেখল সে— বাবাঃ, এতটা বাজেটে ছিলনা, যাক্‌গে দিয়ে দিন।

পথে নেমে দু'হাতে ধরা শাড়ির বাক্সে ঠোঁট ছুঁইয়ে বনশ্রী বলল— এই শাড়ীতে আমাকে কেমন মানাবে বলত?

অবসন্ন গলায় আমি বললাম— ভাল।

ট্রামে উঠলাম। সে বসে, আমি দাঁড়িয়ে। আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। নির্বাক।

বাকি পথ নিরবেই কেটে গেল। বাড়ি ঢুকে উঠানে দাঁড়িয়ে শুধু বললাম— আসছি—তারপর ওপরে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে খুব কষ্ট লাগছিল, মনে হচ্ছিল পড়ে যাবো। ঘরে ঢুকে ক্লান্ত শরীর বিছানায় ঢেলে দিলাম।

ক্ষীণ শব্দের ডাক ক্রমশ স্পষ্ট হতে হতে ঘুম ভাঙল। মা ডাকছিল।

—খাবিতো ওঠ! ও খোকা— মা বলছিল।

খেতে বসার সময় আমি প্রায় দিনই আসনটা পেতে নিই, আসন পেতে বসলাম। মাথার মধ্যে কেমন একটা ফাঁকা ভাব— যেন ধু ধু মাঠ, আধো অন্ধকার।

খাবার গোছাতে গোছাতে মা বলল— আজ আমি মনের কথাটা বেনুর মাকে বলে দিয়েছি।

চমকে উঠলাম আমি— কি বলেছ?

—ওরে না না, তুই যা ভাবছিস তা নয়— খাবার ধরে দিতে দিতে মা বলল— হাজার হোক আমি ছেলের মা, আমি কি আগ বাড়িয়ে বিয়ের কথা পাড়তে পারি? আমি শুধু বলছিলাম— বেনু বড় ভাল মেয়ে, ওর বিয়ের জন্য আপনাকে বেশী ভাবতে হবে না।

—তাতে কি হলো? —অস্থির গলায় বললাম আমি?

—হবে আবার কি! আমি ওটুকু বলতেই বললেন কি— নিন্‌না দিদি মেয়েকে, আপনার পায়ে ঠাঁই দিননা— বলতে বলতে মা আমার সামনে বসে পড়ল, বলল ভদ্রমহিলা ভারী সরল রে, মনের কথা গড় গড় করে বলে ফেলল, বলল— ভগবানের কি ইচ্ছা জানিনা, এতদিনে বোধহয় মুখ তুলে চেয়েছেন আর তাই আপনার কাছে এনে দিয়েছেন।

মা বুঝতে পারছিল না মায়ের কথাগুলির প্রতিক্রিয়া। মাকে আমি কিভাবে বোঝাবো? বললাম— কিন্তু মা, আমার সামর্থ কোথায়?

মা কি বুঝল জানিনা, একটু চুপ করে থেকে বলল— ও চিন্তা তুই করিস না, মেয়ের মনের ভাবতো আমি জানি! সময় পেলেই ওপরে এসে এমন আমার কাছে কাছে ঘোরে কি বলব! যে ওর মুখের দিকে তাকাবে সেই বুঝে নেবে মনের কথা। অথচ ওর মা বলছিল আগে নাকি বিয়ের কথায় ওর মন ছিলনা, কত ভাল ভাল সম্বন্ধ যে নাকচ করেছে!

—আমি কৃতার্থ মা, কিন্তু—

মা আমার কথা শুনতে চাইল না, মৃদু ধমক দিয়ে বলল— তোর ওসব কিন্তু টিন্তু রেখে খেয়ে নে।

এতক্ষণ খাওয়া শুরুই করিনি দেখছি, রুটি ছিঁড়ে মুখে দিলাম, খেতে ভাল লাগছিল না।

—কথা আমি দিয়ে দিয়েছি— হঠাৎ বলে উঠল মা।

আমি সন্ত্রস্ত, কোনওক্রমে ঢোক গিলে বললাম— তুমি কথা দিয়ে দিলে?

— দেবো না? —মা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল, বলল— আমরা খুবই সামান্য মানুষ রে খোকা, অমন করে চাওয়ার মতো বড় আমরা নই। তাছাড়া আমি কি তোর মন বুঝিনা? তুই মনস্থির করে ফেল, অতো ভাবিস্ না। এতো ভালই হল রে। আমার কি ভাবনা কম ছিল? যে যার সংসারে সবাই নিজেরটা নিয়েই ব্যস্ত, আমার জন্য চিন্তা করবার কার সময় আছে? কে তোর জন্য মেয়ে দেখবে, কে তোর বিয়ের ব্যবস্থা করবে? আমি বিধবা মানুষ কোথায় যাব কার সঙ্গে কথা বলব—

এত সব কথা শুনতে শুনতে বিষাদাচ্ছন্ন আমি মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বললাম— বিয়ে করা আমার হবে না মা।

এতক্ষণ মায়ের মুখে একটা সুখের আলো খেলা করছিল, আমার কথায় সহসা সে আলো নিভে গেল। দেখতে দেখতে বেদনার্ত আমি দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম।

চুপচাপ কতক্ষণ, তারপর—

—তাহলে তুমি অমন করে মেয়েটির সঙ্গে মিশছ কেন? —মায়ের শুকনো গলা।

—আর মিশবো না মা।

....বৃক্ষ হননের শব্দ...ভূমিশয্যা নেয় বনস্থলী...আমার প্রিয় সেই উদ্যান...

খাঁচায় আবদ্ধ পাখী আমি তাকে বুকে করে নিয়ে যেতে চাই দূর নিভৃত নির্জনে। আমারই ভেতর থেকে সে আমাকে ভেঙে ফিরে যেতে চায়। আমি তাকে আটক রেখেছি।

মধ্যরাত। নিস্তব্ধ নিঝুম বিশাল শিয়ালদা স্টেশন। প্রবেশ ও প্রস্থান দ্বারগুলি পরিত্যক্ত জীর্ণ পড়ে আছে কতকাল, যেন প্রাগঐতিহাসিক। ঝোড়ো হাওয়া আর বৃষ্টির ঝাপট শুধু মাঝে মাঝে ঢুকে পড়ছে শূন্য চত্বরে— ছুটোছুটি করে খেলা করছে দুরন্ত শিশুর মতো।

যখন এসেছি তখন মানুষের ভীড়ে সমস্ত চত্বর ঠাসাঠসি। গৃহমুখী ব্যস্ত মানুষ। তারা সব ঘরে ফিরে গেছে। শূন্যপুরী এখন ঘুমাবে? অথবা নিদ্রাহীন অপেক্ষা— ফিরবে তারা যারা চলে গেছে।

সবাই কি ফেরে যারা যায়? সবাই কি ফেরে যারা আসে? কিংবা যদিও ফেরে— একই মন?

বেড়ে উঠল বৃষ্টির দাপট। ঝোড়ো হাওয়া আরও তীব্র। এমন সিক্ত দিনে আমার ভেতরে এমন শুষ্কতা কেন? যেন এক রুখুশুখু বালিয়াড়ি!

ঝড় ও বৃষ্টি সেই বিকাল থেকেই মানুষকে ঘরমুখী করেছে। অথচ আমি ঠিক তখন ঝড়বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। শীত লাগছে ভিজে জামাটা গায়েই শুকোলো। ট্রেনে উঠে জানালা বন্ধ করলে একটু উষ্ণতা পাওয়া যেতে পারে। এবার বোধ হয় প্ল্যাটফর্মে গাড়ি দেবে। একটা বাঙ্ক পাওয়া গেলে টানা ঘুমে একেবারে সকাল। মনে হয় এ ট্রেনে ভীড় বিশেষ হবে না। কি জানি, রাত্রি বারোটার এই শেষ ট্রেনে আমি কখনো পিসিমার বাড়ি যাইনি—

শেষ ট্রেন কেন? রাত্রি বারোটায় তো নতুন তারিখ, তবে তো প্রথম ট্রেন। প্রথম ট্রেন আমাকে পৌঁছে দেবে শান্তির দেশে, পরিচিত বন্ধু সেই নদী ও বৃক্ষ যেখানে—

এত শীত লাগছে কেন? শীত এলে ঝরে যায় সবুজ সম্ভার। ছেলেবেলায় দেখতাম শীতের হাওয়ায় কিভাবে ক্রমশ নিঃস্ব হয়ে যেত বাগানের গাছগুলি। চারিদিকে হলদে পাতার রাশি, সেই ঝরা পাতা মাড়িয়ে ঘুরতে ঘুরতে আমার মনে শঙ্কা জাগত, মনে হতো আবার যদি পাতা না আসে? যদি এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে গাছগুলি! খুব অস্থির বোধ করতাম।

এখন আমার মধ্যে সেই অস্থিরতা। আমার জীবন থেকে ঝরে যাচ্ছে সবুজ সম্ভার। আমি জানি সেই শূন্যতা চিরস্থায়ী। আর কোনদিন ফিরবে না সবুজ পাতার রাশি

পুষ্পমুকুল। বনশ্রী এক আশ্চর্য স্নিগ্ধ বনভূমি— সে সম্পদ ফেলে চলে যেতে হবে দূরে।

বুকে ডানার ঝাপট দেয় কে? কে আমাকে ভেঙে ফিরে যেতে চায়?

এতদিন আমি এমন হঠাৎই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছি, চলে গেছি কোথায় কোথায়। বেরিয়ে পড়ার জন্য তখন কি ব্যগ্রতা। আর বেরিয়ে পড়লেই মনে মুক্ত হাওয়ার ছোঁয়া, সেই বাল্যকালের ছুটির আনন্দের মতো।

যখন শিশু ছিলাম মা বলে দুপুরে ঘুমানোর সময় মা আমার কোমরের ঘুনসীতে আঁচলের খুঁট বেঁধে দিতো, ঘুমন্ত মায়ের চারপাশে আমি ঘুরে ঘুরে খেলা করতাম। এতদিন মাকে ছেড়ে বেড়াতে বেরিয়েছি— সে যেন শৈশবের সেই খেলা–মা আছে— মায়ের ওই থাকাটাই সব, কদিন ঘুরে বেড়িয়ে আবার ফিরে আসা স্নেহচ্ছায়ায়।

কখনও কখনও মায়ের জন্য মন উতলা হয়েছে। মা নেই এরকম ভাবনা মনে এলে সব কিছু দুস্থ হ'য়ে যায়। এমনটা আমার চিরকালই। ছেলেবেলায় এক একদিন দুপুরবেলা ঘুমন্ত মাকে দেখে হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন তরাস, সাবধানে মায়ের নাকের কাছে হাত রেখে বুঝতে চাইতাম নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা। সন্দেহ যেত না। আস্তে আস্তে ডাকতাম— মা—ওমা! মা ঘুমের ঘোরে একটু সাড়া দিলে তবে নিশ্চিন্ত।

থমকে গেল ঝড় ও বৃষ্টির শব্দ। প্রবল গর্জনে ঢুকছে ট্রেন। প্লাটফরমে দেখছি গুটি গুটি জড়ো হচ্ছে বেশ কিছু লোকজন। ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে গা বাঁচিয়ে কোথায় না কোথায় সব বসে ছিল।

মধ্যরাত। ছমছমে আলো আঁধারি। ঝড়ের হুঙ্কার আর বৃষ্টির গোঙানি। প্রায় শূন্য ট্রেন।

বুকের ভেতর এক ফাঁকা ট্রেন হু হু শব্দে ছুটে চলে যায়... চারপাশে কাঁপে অন্ধকার...বাতাসের তীক্ষ্ণ ফলা বুনে যায় বিষণ্ণ চাঁদোয়া, ঝুলে থাকে কাতর কাকের ঝুলকালো ডানার পালক, খসে যায় অবিরাম, খসে খসে পড়ে স্তূপাকার...মাঝখানে শুধু দুই সমান্তরাল ইস্পাতের সরীসৃপ, উজ্জ্বল শরীর—

ট্রেন ছুটে যাচ্ছে। আমি শুয়ে আছি। ঝড় বৃষ্টি ও ট্রেনের শব্দ সব একাকার। ঘুম নেই। এত ফাঁকা কামরা? যে ক'জন যাত্রী উঠেছিল এই দীর্ঘ কামরার আট দশটা খোপের মধ্যে তারা কোথায় হারিয়ে গেছে। এই খোপে আমি একা। আরও একজন মানুষ যদি থাকত কথা বলা যেত।

কেউ ডাকে কেউ ডাকেনা, কেউ সঙ্গী চায় কেউ একা একা চলে যায়...

আমি ডাকবোনা একাও যাবনা...পাহাড়ের ওই পথ বেঁকে বেঁকে ঘুরে ঘুরে চলে গেছে আকাশের দিকে। দু'পাশে গাছেরা বাড়িয়ে আছে ছায়াঘন হাত...খোকা তুমি পথ দেখে হাঁটো, হোঁচট লাগলে পড়ে যাবে, গড়িয়ে যাবে নীচে। ওপরে তাকিয়ে হাঁটছ কেন? নিরু, এই ছেলে নিয়ে বড়ো ভাবনা আমার, এত অন্যমনস্ক! কি করে দাঁড়াবে জীবনে? ওই বাবা শুয়ে আছেন, মাথার দু'পাশে ফুলের স্তবক, সমস্ত শরীর ফুলে ঢাকা...ধূপ জ্বলে, গুচ্ছ গুচ্ছ

ধূপ, ধূপের আগুনে বাবাকে লাগবেনা? না, ও শরীরে প্রাণ নেই, ওই চোখ ওই মুখ ওই হাত বুক সব কিছু প্রাণহীন...ওই হাত কতবার ছুঁয়েছে আমাকে স্নেহ ও শাসনে— এখন স্পন্দনহীন। ওই পায়ে পা মিলিয়ে সমুদ্রের তীরে ও পাহাড়ে প্রথম হেঁটেছি, ওই পা ছোঁবেনা মাটি...বুকের ভিতর এক ফাঁকা ট্রেন হু হু শব্দে ছুটে চলে যায়...চারপাশে কাঁপে অন্ধকার...

...মা তুমি কেঁদনা, তোমার ঈশ্বর তোমাকে দেবেনা ফিরে ওই প্রিয় বুকের আশ্রয়! মা তুমি কেঁদনা, ওঠো, মুখ তুলে দেখ। পৃথিবীর সবকিছু এভাবেই একদিন— কে ও? অশ্রুসিক্ত ওই মুখ কার? বেণু তুমি কাঁদছ আমি মৃত শুয়ে আছি, শরীরে ফুলের সাজ, শিয়রে ধূপের শেষ মোহ...তুমি কেঁদনা বেণু, দেখো আমি তুলতে চাইছি এই হাত— তোমার মাথায় মুখে মাখিয়ে দেবো ভালবাসা— পারছি না — আমি মৃত, মৃত এই হাত। বেণু, তুমি কেন এই হাতে তুলে দিলে শকুনের নখ? সমস্ত জীবন আমি ক্ষুণ্ণিবৃত্তির জন্য কুকুরের শব ছিঁড়ে যাবো? বেণু, তুমি কাঁদছো বেণু!

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ট্রেন চলছে দেখছি ধীরে সুস্থে। যেন আপন মনে বেড়াতে বেরিয়েছে। বৃষ্টি কি থামল? কি নিষ্ঠুর স্বপ্ন। আমি একটু শান্তির ঘুম চেয়েছিলাম। শান্তি আমার জীবনে আর আসবে না।

এই রাত আরও কোন অধিকতর অন্ধকার রাতের গর্ভে চলে যাক্...

কত সহজে দুঃখ ঝেড়ে ফেলে হেসে ওঠে প্রকৃতি, আমিতো পারি না। সকালের এই নির্মল আকাশ এই স্বচ্ছ রোদ্দুরে কাল রাতের দুর্যোগের চিহ্ন মাত্র নেই। অথচ আমার মন—

শরতের দিনকাল শেষ হয়ে এলো। বাতাসের মনে উদাস ভাবের আনাগোনা। বাঁধের পথে হাঁটতে হাঁটতে আমি সেই বাতাসের স্পর্শ পেলাম। মাটির দীর্ঘ বাঁধ চলে গেছে কত দূর। যতদূর দৃষ্টি যায় কেউ নেই। শূন্য পথ চলে গেছে দিগন্তের দিকে। আমি কি দিগন্তে পৌঁছাবো?

কতদিন এই পথ দিয়ে হেঁটে গেছি। এ পথে পা দিলেই মন আমার উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। বাঁধের গায়ে এপাশে ওপাশে কিছু দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে এক একটি মহীরুহ— যেন শতাব্দীর— আমি এলে চিরকাল তারা আমাকে সস্নেহে স্বাগত জানায়।

পিসিমা বলেন বিয়ের পর তাঁর বহুকাল অভিযোগ ছিল তাঁর বাবা তাঁকে বনবাসে দিয়েছেন। সে অভিযোগের প্রতিকার করতে প্রত্যেক মাসে ঠাকুরদা আসতেন মেয়ের বাড়ি, চার পাঁচ দিন কাটিয়ে যেতেন।

এ পথে পা দিলে আমার সেই না দেখা মানুষটিকে মনে পড়ে, মনে হয় এই পথ দিয়ে তিনি হেঁটে চলেছেন— এইসব বৃক্ষের ছায়ায় ছায়ায়— আমার কেমন অদ্ভুত লাগে, মায়ের

উক্তির কথা মনে হয়, আমি কি সে মানুষ? সাবালক হওয়ার পর থেকে আমিও তো সে ধারা বজায় রেখেছি— মাঝে মাঝে চলে আসি— কয়েকদিন থাকি।

কেমন আছ হে অশ্বত্থ? তোমার কোলে একটু বসি। কাল রাত থেকে খাওয়া হয়নি। একটু জল পর্যন্ত না। গলাটা শুকিয়ে কাঠ। শরীরও ক্লান্ত। এখনও হাঁটতে হবে কতদূর! সেই নদীর ধার। নদী এখন কানায় কানায়। নৌকোয় পার হতে হবে। ওপারে ঘাটের কাছে আছে বন্ধু শিমূল, তাকে ছুঁয়ে একটু এগোলে দূরে দেখতে পাবো সিংহদ্বারের চূড়া, ছাদের কার্নিশ, তার আগে কোন মনুষ্য বসতি নেই।

না থাক মানুষ, এইতো দু'পাশে দিগন্ত প্রসারী বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতে দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ কোটি প্রাণ! এইতো পথের দু'পাশে দাঁড়িয়ে সব বৃক্ষ প্রাচীন! এই সব পাতায় শাখায় ঝোপেঝাড়ে শস্যের গায়ে কত কীট ও পতঙ্গ পাখী ও সরীসৃপ কত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণ জীবন ধারণে ব্যস্ত। ভাবতে কেমন অবাক লাগে। অথচ কি নিস্তব্ধ চারিদিক। শুধু আমার মাথার ওপর কোথায় পাতার আড়ালে একটা পাখী ডাকছে টুই টুই টুই। এই সব কিছু আমি চিরকাল মনের গভীরে ভালবাসি। কিন্তু আজ কেন সমস্ত কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে আছে এমন বিষাদ?

ওঠো ওঠো চলো, চিন্তা রাখো, এখনও অনেক দূর যেতে হবে। দেখ, কত সহজে দুঃখ ঝেড়ে ফেলে হেসে ওঠে প্রকৃতি। শোনো নদী ডাকে আয়, ডাকে বন্ধু শিমূল, ডাকে সেই বিশাল উদ্যান নাকি বনভূমি, সেই বিস্তীর্ণ বিলের স্বচ্ছ জল— তির তির ঢেউ।

অনুভব করতে পারি কেন ঠাকুরদা এখানে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। এই ভূমি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। এটা তাঁর বন্ধুর বাড়ি, কলকাতায় এক সাথে কলেজে পড়তেন।

পিসিমা বলেন— এখানে এলে বাবা ঘরে থাকতেন কতটুকু। সারাদিন ঘুরে ঘুরেই কাটাতেন। এ বাড়ির বাগানেই কেটে যেত তাঁর অনেকটা সময়। ঠিক আমার মতো— তাইনা পিসিমা— আমি বলি।

এ বাড়ির পাশ দিয়ে যে বিশাল বৃক্ষ মেলা তাকে বাগান না বলে বন বললেই মানায়। এ বনের কাছে আমাদের বাড়ির সেই বাগান তো শিশু!

তারপর সেই বিল— বনের প্রান্ত ছুঁয়ে পড়ে আছে শান্ত এক বিল। একদা নদী ওখান দিয়ে বইতো, আপন খেয়ালে নদী সরে গেছে, রেখে গেছে বিস্তীর্ণ জলাশয়। ওখানে যখন প্রথম আমি এসে দাঁড়িয়েছিলাম সেই বাল্যকালে—

তিনিও কি আমার মতো মুগ্ধ হয়েছিলেন প্রথম দর্শনে? আর পিসিমা? যিনি একদা বনবাসের অভিযোগ করতেন সেই পিসিমা এখন কলকাতা যান না কেন? সেখানে তো ছেলেমেয়েদের স্বচ্ছল বাড়িঘর। কিন্তু তিনি কেন এক দুদিনের জন্যও শহরে গেলে হাঁফিয়ে ওঠেন? এ বাড়ির ছাদে উঠলে মনে হয় সত্যিই আকাশের নীচে আছি, মনে হয় সত্যিই এ পৃথিবী মাটির, প্রকৃতিই এ পৃথিবীর একমাত্র অধীশ্বব।

এখন কি শুক্লপক্ষ? আজ রাতে চাঁদ উঠবে কি? কাচের মত স্বচ্ছ আকাশে চন্দ্রালোক কি শতগুণ উজ্জ্বল হবে আজ?

এই নির্জন বাড়ির ছাদের সৌন্দর্যের কথা আমি তাকে শুনিয়ে ছিলাম। ওই বন ওই সরোবর ওই নদী পূর্ণ জ্যোৎস্নায় কেমন অপরূপ হয়ে ওঠে।

অমন বিহ্বল রাতে নির্জন ছাদে প্রকৃতির কাছে কোন এক অপরূপ নৃত্যমায়া নিবেদন করবে বলেছিল বনশ্রী। প্রকৃতি ছাড়া একজন মাত্র দর্শক থাকবার অনুমতি পেয়েছিল যে আসরে।

কথা ছিল একদিন দু'জনে আসার। কথা ছিল একদিন দুজনে হাঁটবো এই পথ। আজ রাতে যদি আসে চাঁদ আমি কি করে তাকাবো?

বেণু কতদিন তোমাকে দেখিনি। কতযুগ।

কি আশ্চর্য, মাত্র গতকাল বিকেলে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, আর গত পরশু বিকালে আমরা দু'জন কলেজ স্ট্রিট গিয়েছিলাম। শুধু কাল সারাদিন আমি বেণুকে এড়িয়ে থেকেছি, শুধু কাল আমি তাকে দেখিনি, অথচ— আরে ও ভাই মাঝি দাঁড়াও দাঁড়াও—

একটি শিশুকে নিয়ে ছ'জন যাত্রী। আমাকে নিয়ে দাঁড়াল সাতজন। নৌকা ছাড়ল। সাদা পাল আস্তে আস্তে ফুলে উঠছে টান টান, ক্যাঁচ ক্যাঁচ কট্ কট্ শব্দ উঠছে বাঁশের টানায়। নদীতে কি হাওয়া বেশি বয়? ঠাণ্ডা হাওয়ায় জুড়িয়ে যাচ্ছে ক্লান্তি। মাঝিকে জিজ্ঞাসা করলাম— হ্যাঁগো মাঝি খাবার জল আছে? —মাঝি মুখ ফেরালো চেনা মানুষ।

—আরে নিত্যদা নাকি! মাঝিকে ডাকলাম।

—হ্যাঁগো দাদাবাবু, ভোরের গাড়িতে এলে বুঝি?

আমি মাথা নাড়লাম।

—ছইয়ের ভিতরে দেখ, কলসী আছে।

ছইয়ের ভিতর দুটি বউ একটি দামাল শিশু, আমি ইতস্ততঃ করছিলাম।

দামাল শিশুটি আমার দিকে হাত তুলে ডাকল— তা-তা। কি বলতে চাইল কে জানে, আমি ভেতরে ঢুকলাম। কাঠের খোঁদালে বসানো মাটির কলসী, আমি জল গড়িয়ে খেলাম। কি ঠাণ্ডা জল! মুখ থেকে গলা বেয়ে নেমে গেল শান্তি, সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। জল পেয়ে আমি বুঝতে পারলাম আমি কতখানি তৃষ্ণার্ত ছিলাম।

চারিদিকে অথৈ জল, মাঝখানে ভাসমান এই যে গতিময় এ কি ভূখণ্ড? জীবন কি এমনই? মনে হয় ভূখণ্ডে, দাঁড়িয়ে, কিন্তু সত্যি নয়? কোথায় ভেসে চলেছি আমি? আর কি ঘরে ফেরার ইচ্ছা নেই? যদি ফিরি সে কোন ঘরে?

আমাদের বাড়ির কাছে সেও এই নদী। এই স্রোত একসময় ছুঁয়ে যাবে সেই ফেরী ঘাট।

সেই প্রিয় ফেরী ঘাট— এক একদিন দুপুরে আমি কোন মনমতো বই হাতে চলে যেতাম ফেরিঘাটে, তারপর টিকিট কেটে স্টীমার ওপারে— যায় আসে, আসে যায়, আমি

বই পড়তাম, কখন আকাশ দেখতাম কখন জল— একটা কাক উড়ে উড়ে নদী পার হয়ে গেল— কেন?

এসব গল্প আমি বনশ্রীকে বলেছিলাম। অতঃপর একদিন আমরা দু'জন টিকিট কেটে স্টীমারে উঠলাম, তারপর পারাপার... রেলিং-এর ধার ঘেঁষে আমরা দুজন— কি আশ্চর্য সময় কেটে গেল কতক্ষণ! সূর্য ডুবুডুবু...নদীতে আলোর দীর্ঘ পথ...

স্রোতের টানে নৌকা কি অন্য কোন ঘাটে এলো? কোথা সেই বন্ধু শিমূল— ওকি! ও কে দাঁড়িয়ে খেয়া ঘাটে? দগ্ধ এক নিঃস্ব বৃক্ষকাণ্ড!

—নিত্যদাদা, সেই গাছ কোথা গেল? সেই শিমূল? আমি হাহাকার করে উঠলাম।

—ওইতোগো দাঁড়িয়ে, বাজ পড়েছিল—

কোথায় পালাবো আমি! অদৃশ্যে দাঁড়িয়ে জালিয়াত হাসে বিদ্রুপের হাসি। সে নেবে আমার সব, আমি যেখানেই যাই যতদূর সে আছে পিছনে শিকারীর মতো, এভাবে একদিন সে নেবে আমাকে।

মৃত বন্ধুর পাশে বসে থাকি ছায়াহীন...ছুঁয়ে থাকি মৃত শরীর। আর কি বা আমি করতে পারি! আমার একান্ত ইচ্ছা ওই দেহে ফোটাতে পারবে না একটি সবুজ পাতা কিংবা মুকুল।

দুপুর গড়িয়ে গেল, খেয়া পারাপার হলো কতবার কত মানুষ এলো গেল, আমি বসেছিলাম ঠায়।

নিত্যদা ডাকল— দাদাবাবু, বাড়ি যাবেনি?

নদী তরঙ্গে দোলে নৌকা, দোলে মাঝি, দোলে অনিত্য জীবন, নৌকার গলুইয়ে বসে নিত্যদা দুলছিল।

—আমারও বড় লেগেছিল গো— উঁচু গলায় বলল নিত্যদা— কতদিনের সাথী বলো! ওপার থেকে ওইতো ছিল আমাদের এপারের নিশানা।

আমি উঠলাম। প্রায় চলচ্ছক্তিহীন আমি পা টেনে টেনে চললাম।

দিন গেল। রাত্রি এলো।

এখন মধ্যরাত্রে খোলা আকাশের নীচে ছাদে বসে আছি। চারিদিক কি নিথর। কোন এক অলৌকিক উজ্জ্বল ধাতু তরলিত গড়িয়ে পড়ছে চাঁদ থেকে। হেমন্তের হিমে সে উজ্জ্বল জমাট বাঁধছে বাড়িঘর, গাছপালা, জলাশয় নদী বুকে। জমাট বিশ্বচরাচর প্রাণহীন।

চাইনা, আমি এই জমাট নিথর ভুবন চাইনা। আমার বুকের মধ্যেও জমাট বাঁধছে কি যেন পাথর। অন্ততঃ একটু বাতাস উঠুক, নড়ে উঠুক গাছপালা, কেঁপে উঠুক জলাশয়, স্থির মেঘের সাদা খণ্ডগুলি চাঁদের মুখ ছুঁয়ে ভেসে যাক।

....উজ্জ্বল শূন্যে আমি ফাঁসবদ্ধ ঝুলে আছি...ধূসর শরীর, ধূসর পোযাক...বহু নীচে উজ্জ্বল ধোঁয়ার আড়ালে কর্দমাক্ত জলাশয়, অসংখ্য ধূসর সাপেরা সেথা খেলা করে,

পরস্পর শরীরে শরীরে কিলবিল, মাঝে মাঝে মুখ তুলে দেখে, লিকলিকে সরু জিভ— দ্বিখণ্ডিত... আমি মৃত ঝুলে আছি, যে কোন মুহূর্তে তলিয়ে যাবো উজ্জ্বল আঁধারে...

খেয়া ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকে দগ্ধ এক গাছ
সারাদিন খেয়া যায় আসে,
দিনশেষে পারাপার বন্ধ ক'রে
ঘাট থেকে একটু দূরে নৌকা বাঁধে মাঝি
তখনও সে দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়।

পত্রসাজ উড়ে পুড়ে গেছে
শাখা প্রশাখার মোহজাল
তাও নেই
সরল দীর্ঘ দেহ, আর
উর্দ্ধ দুই বাহু শুধু
কাকে যেন ডাক দিতে গিয়ে নিস্পন্দ স্থবির।

অথচ কি দুরন্ত স্পন্দন ছিল একদিন পাতায় শাখায়
দিনে রাতে বৃষ্টিতে বাতাসে অনিন্দ্য জ্যোৎস্নায়।
কে আসার কথা ছিল খেয়া পার হয়ে?
কার অপেক্ষায় তার কেটে গেছে হিল্লোলিত সবুজের দিন
নদী জানে? খেয়া ঘাট? পারানির খেয়া?

খেয়া ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকে দগ্ধ এক গাছ ভাসানের অপেক্ষায়
অন্তিম ঝড়ের লগ্নে ছিঁড়ে যাবে জীর্ণ শিকড়, সে যাবে ভাসানে...

কিছু অশ্রু কিছু শোক কিংবা কিছু অক্ষরের হাহুতাশ— মৃত বন্ধুর জন্য আর কি বা আমি দিতে পারি! আমার একান্ত ইচ্ছা ওই দেহে ফোটাতে পারবে না একটি সবুজ পাতা কিংবা মুকুল।

শেষবেশ ওটুকুই থাকে। শিলালিপি গুহাচিত্র ছিন্নপত্র জীর্ণ পাণ্ডুলিপি...সব কিছু হারিয়ে গেলে ওইটুকু ধরে রাখে প্রিয়জন, বাঁচিয়ে রাখে সন্তর্পনে। কিন্তু অক্ষম আমি মৃত বন্ধুর

কথা লিখতে গিয়ে দেখি লিখেছি নিজেরই হতাশার ম্লান প্রতিচ্ছবি। সমস্ত জীবন ব্যর্থ অপেক্ষায় কাটিয়ে আমি এক দগ্ধ প্রাণ দাঁড়িয়ে আছি ভাসানের অপেক্ষায়...

যার কাছ থেকে নিজেকে এমন করে দূরে সরিয়ে নিয়ে এলাম আমার সমগ্র সত্ত্বা তারই কাছে ছুটে গিয়ে একটু সান্ত্বনা পেতে একান্ত উন্মুখ।

কিন্তু বেনু ওভাবে বাঁচতে পারবো না আমি। নিজেকে বিক্রি করে ওভাবে বাঁচা যায়না...

এ জীবনে তোমাকে পাওয়া হলো না বেনু, এ জীবন কাটিয়ে যেতে হবে একা। দিন যাবে রাত্রি আসবে, রাত্রি যাবে পুনরায় দিন, আমি থাকবো ভাসানের অপেক্ষায়...

কেন যে নিজেকে এত নিঃস্ব মনে হয়!

সকালের শান্ত রোদ কবিতার পংক্তি ছুঁয়ে আছে। কোথা কোন শব্দ নেই। পাখীরা ভোরের গান শেষ করে উড়ে গেছে কোথায় কোথায়। সামনে জানলার ওপারে নম্র বাতাসে দুলছে শিরীষের শাখা।

এই ঘর এবাড়ীর শেষ প্রান্ত। এরপর থেকেই শুরু গাছপালার ভীড়। পাখিদের কলকাকলি আর গাছেদের কথোপকথনের শব্দ ছাড়া আর বিশেষ কিছু এঘরের নৈঃশব্দে আঁচড় কাটে না। এজন্য দোতলায় এই প্রান্তের ঘরটি আমার বড়ো প্রিয়।

অথচ এখন এই ঘরে যেন নির্বাসনে আছি মনে হয়। এই ঘর এই বারান্দা এটুকু সীমানার মধ্যেই বন্দী যেন কাটিয়ে দিচ্ছি যন্ত্রণাময় দিন। কতগুলি দিন এভাবেই কেটে গেল।

প্রিয় সেই নদীতীরেও আর যাই না। সেখানে যে পড়ে আছে মৃত বন্ধু।

জানি বন্ধু তোমার জীবনে আমার মত এমনতরো খেদ ছিল না। আমি যে দেখেছি তোমার আনন্দময় জীবন। সম্ভবত মৃত্যুর মুহূর্তেও তুমি ছিলে খেদহীন। তোমাকেতো মৃত্যু দেয়নি মানুষের নৃশংস কুঠার। যে তোমাকে জন্ম দিয়েছে যে তোমাকে দিয়েছে আনন্দময় জীবন সেই তোমাকে দিয়েছে মৃত্যু। তুমি ছিলে একান্ত তারই অধীন।

কিন্তু আমি মানুষ, আমি প্রকৃতির অধীন হয়েও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করি, অনাবিল আনন্দের স্রোত থেকে জড়ো করি দুঃখের পলিমাটি।

কাটাকুটি জীর্ণ কবিতা লেখা কাগজটি হাতে তুলে নিই আমি। কদিনের ব্যর্থ প্রচেষ্টার ক্ষত। আস্তে আস্তে ছিঁড়ি, জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিই। শিরীষের বাড়িয়ে দেওয়া শাখা ছুঁয়ে কাগজের টুকরোগুলি দুলে দুলে নেমে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে আমার দৃষ্টি ঝাপসা।

সৃষ্টির একান্ত ইচ্ছা এ জীবনে অপূর্ণই থেকে গেল। সময় নিপুন যোদ্ধা, আমাকে নির্মম হাতে শেষ করে দিলো।

হেরে তো যাবই জানি, তবু সাধ ছিল যতদিন আছি ভোগ করে নেব এ আনন্দমেলা। আর সাধ কিছু সৃষ্টি—

সে আমাকে সুযোগ দিল না। কি নিয়ে বাঁচবো আমি?

কে যেন ডাকছে—

পিসীমা?

তাঁর অনুসন্ধিৎসু সৃষ্টি আমার চোখের ওপর, কেমন অস্বস্তি লাগে। ও দৃষ্টি কি পৌঁছে যাবে আমার গভীরে? দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম। শাড়ীর লাল পাড়ের ওপর চোখ রেখে অহেতুক উচ্ছ্বাস দেখিয়ে বললাম— পিসীমা বুঝি মন্দিরে যাচ্ছো? আজ আমি তোমার সঙ্গে ফুল তুলবো।

কিন্তু পিসীমা অবিচল। একইভাবে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তারপর ছোট্ট করে বললেন— আয়।

দীর্ঘ বারান্দা দিয়ে তিনি এগিয়ে চললেন, চিন্তিত আমি পিছনে পিছনে।

পিসীমার একটি চুলও কালো নেই। সাদা চুলের সিঁথিতে সিঁদুর, সিঁথির দুপাশের চুল অনেক দূর লাল রঙ ধরিয়েছে। অনেক বয়স হলো পিসীমার, শরীরও দুর্বল, কিন্তু মাথা সোজা রেখে হাঁটার ভঙ্গী আজও একইরকম।

আমরা উঠোনে নামলাম। উঠোন নয়ত-খেলার মাঠ। সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে খেলা করছে পায়রার ঝাঁক। বাঁধানো চত্বরে সরু সরু ফাটলের নানা রেখা, ফাঁকে ফাঁকে জন্মেছে ঘাস।

উঠোনের পূর্বপ্রান্তের ওই দরজা পেরিয়ে গেলে ওপাশে ঠাকুর বাড়ি। ওখানে আছে রাধামাধবের মন্দির। আমরা এগোলাম। আমাদের পদক্ষেপে পায়রারা বকম বকম শব্দ তুলে সরে গেল।

দরজা পেরিয়েও কয়েকপা চুপচাপ হাঁটলেন পিসিমা, তারপর— তোর কি হয়েছে বলতো? ভোরবেলা উঠে বেড়াতে যাচ্ছিস না, সারাদিন টোটো করে ঘুরছিসনা, সব সময় যেন কেমন মনমরা হয়ে চুপচাপ বসে আছিস?

—পিসেমশাই কবে ফিরবেন পিসিমা? আমি তাড়াতাড়ি অন্য কথায়।

—সে এখন কলকাতায় গেছে, এ ছেলের কাছে ও ছেলের কাছে করে পূজো কাটিয়ে তবে ফিরবে। কিন্তু তুই কথা ঘোরাচ্ছিস কেন? তোর মন ভাল নেই রে, কিছু একটা নিশ্চয় ঘটেছে, ও আমি ঠিক বুঝতে পারি।

ভেতরের অস্বস্তি বেড়েই যাচ্ছিল, কোনক্রমে বললাম— কি যে বলো পিসিমা। টো টো করে ঘুরিনা এ তো ভালই। কতো ভালো ছেলে হয়ে গেছি বলো! সারাদিন ঘরে আছি, তোমাকে খাবার নিয়ে বসে থাকতে হয়না, আগেতো এ নিয়ে কতো বকাবকি করতে।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা শিউলি গাছের কাছে। ফুলে ছেয়ে আছে বৃক্ষতল। মাটি ঢেকে গেছে যেন। দীর্ঘশ্বাসে বুক খালি করে সুগন্ধী বাতাসে বুকে ভরে নিলাম আমি।

সন্তর্পনে ফুলগুলিকে বাঁচিয়ে পা ফেলছিলেন পিসিমা এবং আমিও। আমরা মন্দিরে পৌঁছলাম। দাঁড়া আসছি— বললেন পিসিমা, মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন।

বাড়ির শুধুমাত্র এই এলাকাটিতে মালিন্যের কোনও ছাপ নেই। পাথরে বাঁধানো মন্দির চত্বরে থেকে শুরু করে বাগানের ফুল গাছগুলি পর্যন্ত সব কিছু যেন সদ্যস্নাত।

এই মন্দির এই বাগানের মলিন দশা ঘুচিয়ে যে এমন পরিপাটি করে তুলেছে সে ভোলানাথ। কিন্তু কোথায় সে? এসে পর্যন্ত তার সঙ্গে দেখা হয়নি। আমিতো এদিকে আসিই নি! এই ফুলবাগান পেরিয়ে পুকুর, পুকুরের ওপাশে ভোলানাথের থাকার ঘর। আগে কেমন নিশ্চিন্তে চলে যেতাম ওদিকে, কিন্তু এখন দেখছি সঙ্কোচ লাগছে। এবার এসে শুনলাম পিসিমা ভোলানাথের বিয়ে দিয়েছেন। শুনেছি সে বউও খুব কাজের মেয়ে। ভোলানাথের প্রশংসায় পিসীমা পঞ্চমুখ, তার ওপর তার বউয়ের গল্পগাছায় ওঁকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করবো? বাবার চেয়েও বয়সে বড়ো পিসিমাকে আমি যেমন ভালবাসি তেমন ভয়ও করি। ওঁর দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে কোন কিছু লুকানো আমার পক্ষে অসম্ভব।

সাজি হাতে মন্দির থেকে নেমে এলেন পিসিমা। এগিয়ে গেলেন শিউলি তলার দিকে।

...ভোরের পবিত্র রোদে একটি বালিকা সাজি হাতে নেমে যায় পুষ্পোদ্যানে...চারপাশে সুগন্ধি ফুলের ঝালর... সুগন্ধী বাতাস তাকে ছুঁয়ে ...সেই আকাশ সেই সূর্য্য সে বাতাস সকলে রয়েছে তবু সে বালিকা কেন যে হায়ার...

উবু হয়ে বসে একটি একটি করে ফুল কুড়িয়ে সাজিতে রাখেন পিসিমা। চুল তাঁর রোদ লেগে রূপার মতো চিকচিক করে। ভিজে চুলের জল অনেকখানি ভিজিয়ে দিয়েছে লালপাড় শাড়ির আঁচল।

এ দৃশ্যও একদিন থাকবে না। এমন এক সকালের রোদ ছুঁয়ে থাকবে এই প্রাঙ্গন, এমনি ফুল ঝরে থাকবে, অথচ এমন করে কুড়িয়ে তুলবে না ওই সজীব আঙুল ...আমার খুব কষ্ট লাগল, অমি পিসিমার কাছে এগিয়ে গেলাম, বললাম—আমি দুটো ফুল কুড়িয়ে দেবো পিসিমা?

—দিবি? —পিসিমা মুখ তুলে বললেন— তোর কি বাসি কাপড়?

—না পিসীমা আমিতো পাজামা পরে ঘুমিয়ে ছিলাম, সকালে এই ধুতি পরেছি, দ্যাখো, পিসেমশায়ের কাচাধুতি, তুমিই তো কাল দিয়েছ।

—তাহলে কুড়িয়ে দে। দ্যাখনা, এখন আর দাঁড়িয়ে থেকে নিচু হতে পারিনা, বুকে কেমন চাপ লাগে, মাথা দপদপ করে, তাইতো বসে বসে ফুল কুড়োই।

সাবধানে ধুলো বাঁচিয়ে ফুলগুলি তুলে নিই আমি, সাজিতে রাখি।

—আচ্ছা পিসীমা, ছোটবেলায় কখনো তুমি ফুল কুড়োতে যেতে?

—যেতাম না? ছেলেবেলায় আমাদের কতো ব্রত করতে হ'তো জানিস?

একহাতে সাজি নিয়ে অন্য হাতে হাঁটুতে ভর দিয়ে কষ্ট করে উঠে দাঁড়ালেন পিসীমা, একটুক্ষণ চুপ করে মাটির দিকে চেয়ে কি যেন ভাবলেন,—ব্রত করতে করতে সেই ছোট বয়সেই তো বিয়ে হয়ে গেল রে!

পিসীমা কি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন? বললেন—তখন এ সংসারের জৌলুস কি!

নিঃশব্দে কয়েক পা হাঁটলেন পিসীমা, অপরাজিতা লতার কাছে দাঁড়ালেন, নিজের মনেই বললেন—তাইতো মাঝে মাঝে ভাবি আমিই কি কুলক্ষণা? আমার দুর্ভাগ্যেই কি সব কিছু এমন করে শেষ হয়ে গেল?

—কি যে বলো পিসীমা! প্রতিবাদের গলায় বললাম আমি।

—না রে, ঠিকই বলছি, না হলে আমার নিজের সন্তান কি না এসব বেচে দিতে চায়!

—কি বলছ পিসিমা? —আমি অবাক।

—হ্যাঁরে! এমনিতে তো ছেলেরা কত আসে! তার মধ্যে যখনই বা আসে তখনই খালি ওই কথা। মাসখানেক আগে সুজয় এসেছিল, এবারে খুব ধরেছে, পাকাপাকি একটা কিছু করে ফেলতে চায়। এদিকের টাকা নিয়ে গিয়ে কলকাতায় ফ্ল্যাট কিনবে। ভরসা ঐটুকু— বিষণ্ণ গলায় বললেন পিসিমা— তোর পিসেমশাই আমার অমতে কিছু করবেনা।

শিউলি, অপরাজিতা— তারপর আমরা টগর তুলি, করবীর ডাল নুইয়ে কয়েকগুচ্ছ ফুল তুলতে না তুলতেই সাজি উপছে যায়।

মন্দিরের দিকে ফিরলেন পিসিমা, বললেন— আমি ওদের স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি— তোমাদের আমি একটা পয়সাও নিইনা, সুতরাং তোমরা তোমাদের মতো থাকো আমাদের আমাদের মতো থাকতে দাও। —বলতে বলতে ম্লান হাসলেন, বললেন— আমি যে ভুলতে পারি না রে, সেইসব ভরভরন্ত দিন গুলির কথা আমি যে ভুলতে পারিনা।

এ যে হাহাকার! পিসিমাকে এমন বিচলিত আমি কখনো দেখিনি। অথচ সান্ত্বনা দেওয়া কোনও ক্ষমতা আমার নেই। দুর্বল কণ্ঠে এলোমেলোভাবে আমি বললাম— দুঃখ কোরো না পিসিমা, দুঃখ কোরো না। কিছুই থাকেনা, এ পৃথিবীতে চিরকাল কিছুই থাকে না।

আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে পিসিমা আস্তে আস্তে উঠে যান মন্দিরে। এখন তিনি তাঁর প্রিয় বিগ্রহকে ফুলে ফুলে সাজাতে সাজাতে ভুলে থাকবেন দুঃখ। কিন্তু আমি? আমি এখন কি করব? ভরভরন্ত দিন গুলির কথা যে কিছুতেই ভোল যায় না!

প্রতিটি মানুষ এক স্মৃতির আধার। শৈশবের স্মৃতি কৈশোরে, কৈশোরের স্মৃতি যৌবনে, যৌবনের স্মৃতি বার্ধক্য— এভাবেই স্মৃতির পাত্রগুলি আঁকড়ে ধরে মানুষ। তারপর একদিন—

এলোমেলো ঘুরতে ঘুরতে আমি ফুলেদের কাছে কাছে যাই। প্রশস্ত এ বাগিচার অজস্র ফুলের কতটুকুইবা পিসিমা নিলেন! মাধবীলতার থোকা থোকা ফুলগুলি আমি নাড়িয়ে দিলাম, যুঁই ফুলের পাপড়িগুলি আলতো ছুঁয়ে রজনীগন্ধার শীষগুলি দুলিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেলাম সংখ্যায় অল্প মহার্ঘ্য গোলাপদের কাছে, একটি গোলাপের বুকে অবনত হয়ে বুক ভরে সুগন্ধ নিলাম।

এই ছোট্ট গোলাপ— তার প্রতিটি পাপড়িতে পড়েছে অমল রোদ্দুর— অনেকক্ষণ

ধরে খুব কাছ থেকে দেখলাম আমি তারপর সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। যতদূর দৃষ্টি যায়— মন্দির চূড়া থেকে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ উদ্যানের প্রতিটি গাছের পাতা প্রতিটি ফুল ছুঁয়ে আছে শান্ত রোদ।

আমার সেই ঘরও এখন ছুঁয়ে আছে এই রোদ মেঝেতে পেতেছে সোনার জাজিম। একই বাতাস খেলা করছে উঠোনে বারান্দায়...

হয়তো এতক্ষণে বেণু তার ঘরে নটরাজ মূর্তির সামনে ধূপ জ্বেলেছে, জ্বেলেছে প্রদীপ। প্রণাম শেষে এবার শুরু করবে নৃত্য অনুশীলন...

সে ঘরে এখন বড়ো মধুর সকাল। ছন্দে ছন্দে বন্দিত নটরাজের স্বর্গীয় হাসি নৃত্যমগ্না বেণুর মনে ছড়িয়ে দিচ্ছে পবিত্র আনন্দ.....

তাই কি? নাকি এই প্রসন্ন সকালে সে ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে আছে আমারই শূন্য ঘরে ক্রমশঃ চোখের কোলে অশ্রু টলমল...

তাহলে?

কতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানিনা, সহসা—

—তুই নিজেই দ্যাখ তোর অবস্থা পিসিমার কণ্ঠস্বর—

আমি চমকে উঠলাম, মুখ নীচু করলাম। আমার হাতে দেখছি একটি রক্তগোলাপ, কখন অন্য মনে তুলেছি। আমি গভীর মনোযোগে গোলাপের পাপড়ি গুণতে চাইলাম।

—এ ছেলেকে নিয়ে আমি এখন কি যে করি! —খেদের গলায় বললেন পিসিমা— আমি ঠিক বুঝতে পারছি তুই একটা কিছু ঘটিয়েছিস।

আমি চুপ।

—কি হয়েছে বল! একটু চড়া গলায় বললেন পিসিমা।

আমি একইভাবে। মুখ না তুলেও বুঝতে পারছিলাম পিসিমা এক দৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনলাম, তারপর পুনরায় খেদ— আমি জানতাম একদিন না একদিন কিছু একটা ঘটাবি। ও রকম উড়ু উড়ু ভাব যে ছেলের সে প্রেমে পড়বেনা এ হতে পারে! আর পড়বে যখন ঘাড় গুঁজেই পড়বে। তোর এমনতরো ভাবগতিক দেখে আমি তোর মাকে চিঠি লিখেছি।

আমি সন্ত্রস্ত, কাতর গলায় বললাম— কি লিখেছ পিসীমা?

—আমি কি লিখেছি তোকে বলতে হবে? —ধমক দিলেন পিসিমা— চল মুড়ি টুড়ি খাবি চল। মন্দিরাকে বলেছি নারকোল কুরতে, তুই মুড়ি দিয়ে খেতে ভালোবাসিস।

পিসিমার পিছু পিছু মন্থর পায়ে হাঁটি আমি। চলতে চলতে আনমনে ফুলের গন্ধ নিতে গিয়ে দেখি পাপড়ি গুনতে গুনতে কখন ম্লান হয়েছে গোলাপ।

একদিন বনশ্রী বলেছিল—

সহসা আমার পা দুটি পাথর...ক্রমশ সমস্ত শরীর যেন শীতল পাথর হয়ে যায়...
একদিন আমি যে তাকে আশ্বাস দিয়েছিলাম...

মৃত্যু তুমি হাত ধরে নাও, আমি এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবো। মৃত্যু তুমি হাত ধরে নাও, আমি এই দুঃখের পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবো। একদিন আমি তাকে আশ্বাস দিয়েছি, আজ সেই আশ্বাসের কথা তার কাছে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ। যত দিন যাচ্ছে তত বেড়ে উঠছে অপরাধের ভার, এ ভার আমি বইবো কি করে?

ফেরারও কোনও দরজা নেই। মা-কে আমি যে সব কথা বলেছি এতদিনে সে সব কথা সে বাড়ির প্রতিটি ইটও জেনেছে— সে বাড়িতে ফিরবো কোথায়?

পৃথিবীর আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে এলো...সূর্য আরও দূরে সরে যায়... ক্রমশ হিমের যুগ মুছে দেবে প্রাণময় ভূমি, তুষার স্তরের নিচে ফসিল প্রস্তুতি পর্ব শুরু হবে। তার আগে উত্তাপের স্মৃতি রোমন্থনে এভাবেই কেটে যাক দু-একটি দিন। আর কিছু করণীয় নেই, জড় পর্দাথের মতো শুধু পড়ে থাকা। হয়তো বা মাঝে মাঝে উত্তাপের আশ্রয় খুঁজতে ভুল করে এগিয়ে যাবে অসাড় আঙুল। আর কিছু করণীয় নেই, সৃষ্টির একান্ত ইচ্ছা দূর আকাশের গায়ে ঝুলে থাকে ম্লান লণ্ঠন, একদার উজ্জ্বল সূর্য...

এরকম মনে হয় আমি দিনে দিনে ক্রমশঃ ফসিল। এভাবেই কেটে যাচ্ছে সময়। যখন শুয়ে থাকি শুয়েই থাকি, যখন বসে থাকি বসে বসেই কেটে যায় বেলা।

এই যে পিসিমা হুকুম দিয়েছেন ভোলার সঙ্গে বিলডাঙা যেতে হবে। আগে এরকম কারও যাবার কথা শুনলে মন ছটফট— আমিই সঙ্গে যাবার কথা তুলতাম। পিসিমা বলতেন— কোথায় যাবি? সারাটা বেলা কাটবে, ঠিকমতো খাওয়া হবে না— কিন্তু আমি যেতামই।

কিন্তু আজ সেই কখন থেকে রান্নাবাড়ির দালানে নিরুৎসাহ আমি চুপচাপ বসে আছি। দেখছি বাতাবীলেবুর গাছে ঠোঁট দিয়ে ডানা মাজছে তো মাজছেই একটা শালিক। মনে হচ্ছে এভাবেই কেটে যাক না কেন দিন।

বেলা বাড়ছে। রোদ আমার পায়ের কাছ থেকে সরে সরে ভোলার কাছে পৌঁছে গেল। মুড়ি খাওয়া শেষ হলো ভোলার, যে দুটো চারটে মুড়ি খেতে খেতে কাঁসি থেকে পড়ে গিয়েছিল একটা একটা করে কুড়িয়ে নিয়ে গালে ফেলল ভোলা, কাঁসিতেও যেটুকু খুদ কুঁড়ো ছিল হাতে ঢেলে মুখে দিল।

একটু তফাতে দাঁড়িয়ে পিসিমা এতক্ষণ ভোলাকে নানান নির্দেশ দিচ্ছিলেন— নবীনকে একবার দেখা করতে বলবি, হরিদাসকে বলবি রাসপূর্ণিমায় উৎসবের সব দায়িত্ব এবার তাকেই নিতে হবে— ইত্যাদি। কিছু আমার কানে যাচ্ছিল কিছু যাচ্ছিল না। হঠাৎ পিসিমা ধমকে উঠলেন— ওই কটা মুড়ি কুড়িয়ে না খেলে কি তোর পেট ভরছিল না ভোলা?

কতদিন তোকে বলেছি কুড়িয়ে খাবি না, কথাটা কি তোর কানে যায় না?

লাজুক লাজুক হাসল ভোলা, ঘটি তুলে নিয়ে আলগোছে জল ঢালল গলায়, ঘটি নামিয়ে বলল— চলগো ছোড়দা।

পিসিমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে ভোলার বউ। অন্য সময় তাকে সামান্য যতটুকু চোখে পড়ে ঘোমটা থাকে নাক ছুঁয়ে এখন তার ঘোমটা কপালের কাছে। দেখলাম দৃষ্টিতে কি যেন তরঙ্গ বহে গেল তার ও ভোলার মধ্যে। যেন আমি ও পিসিমা এখানে নেই, শুধু তারা দু'জন। এক মুহুর্ত— ঘোমটা টেনে দিলো মন্দিরা, এগিয়ে এলো হাতের পুঁটুলিটা বাড়িয়ে ধরল।

পুঁটুলি হাতে নিয়ে ভোলা দালান থেকে নামছে, কপালে হাত ঠেকিয়ে মন্দিরা— দেখতে দেখতে আমি উঠলাম।

চলে যাবো, এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবো, মৃত্যু তুমি হাত ধরো, পৃথিবীতে আমি—

বাড়ির এলাকা পেরিয়ে আমরা বাগানের পথে। পায়ে চলা সরু পথে আমি আগে হাঁটছিলাম— ভোলা পিছনে। এ পথে বিশেষ কেউ হাঁটেনা। পথরেখা কোথাও কোথাও বিলুপ্ত। কিন্তু এখানের প্রতিটি গাছপালা ঝোপঝাড় আমার এত চেনা! আমি নিশ্চিন্তে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। বনজ গন্ধ কি যেন স্নিগ্ধ প্রলেপ দিচ্ছে চেতনায়।

ডানপাশে এই ঢিবিটার ওপারে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে সেই বাসন্তিকা। ঢিবিটার ওপরে উঠলেই দেখা যাবে। উঠব নাকি?

পা বাড়ালাম।

—ওদিকে না গো ছোড়দা— পিছন থেকে ভোলা বলল।

—জানিরে, —বললাম আমি— ওখানে একটা গাছ আছে, সেটা দেখব বলে— থাকগে—

—আহা যাওনা— ভোলা বলল— আমি কি বারণ করছি?

ঘাসে ঢাকা ঢিবি বেয়ে আস্তে আস্তে উঠলাম— হ্যাঁ ওইতো দূরে হলদে ফুলে ফুলে ছয়লাপ গাছটি। একবার পিছন ফিরে দেখলাম— না, ভোলাকে দেখা যাচ্ছে না— গাছটির দিকে ফিরে হাত নাড়লাম আমি। কি ওর নাম জানিনা, আমি নাম দিয়েছি বাসন্তিকা। সারা বছর ওর ফুল ফোটার বিরাম নেই। আর এতো ফোটে!

...স্বপ্নের সেই মোহন অরণ্যে আর যাবো না। সে অরণ্যে সে নির্জনে সবুজ ছায়ায় তুমি পবিত্র পুষ্পের মতো ফুটে থাকো। যখন জীবনে সত্যিই এলে স্বপ্ন থেকে নেমে— মনে মনে তোমাকে কতদিন কতরূপে সাজিয়ে দেখেছি। মনভূমে হেঁটে গেছ কতবার স্নিগ্ধ চরণ ফেলে ফেলে ...কত নিঝুম দুপুরে কত বিজন সন্ধ্যায় একাকী নিশ্চুপ শুয়ে তোমাকে হাত ধরে নিয়ে এসেছি এই বনভূমে, বসিয়েছি ওই পুষ্পিত বৃক্ষের পদমূলে, ফুলে ফুলে

সাজিয়ে দিয়েছি, তারপর গাঢ় আলিঙ্গনে...কল্পনার সেই সুখ সত্যি করে তোলার বড় সাধ ছিল।

আস্তে আস্তে ঢিবি থেকে নেমে এলাম।

—কি গাছ? —এগোতে এগোতে জিজ্ঞাসা করল ভোলা।

—জানিনা রে— আমি বললাম।

ভোলা সামনে আমি পিছনে। আদুল গায়ে খাটো ধুতি মালকোচা দিয়ে পরা ভোলার হাতে পুঁটুলি। ডান হাতের পুঁটুলি বাঁ হাতে নিল সে।

ভোলার চেহারা অনেক ভালো হয়েছে। যখন প্রথমবার দেখি কত রোগা ছিল, খড়ি ওঠা শুকনো চেহারা। দেখতে দেখতে আমার মনে ভীষণ ঈর্ষা। আমার চেয়ে বয়সে ছোট অতি সামান্য এই শ্যামলা মানুষটিকে আমি অনেক বেশি ভাগ্যবান ভাবছিলাম।

—হ্যাঁগো ছোড়দা, এবার নাকি তুমি মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেছ? —হঠাৎ বলল সে।

—কে বলল? —ঈর্ষা থেকে বিরক্তি আমার।

চুপচাপ কয়েক পা হাঁটল ভোলা, তারপর বলল— আমার ওপর তুমি রাগ করো না ছোড়দা!

তার গলার মিনতি আমাকে সঙ্কুচিত করল। জানি আমার পিসতুতো দুই দাদা তার ওপর খড়্গ হস্ত। কারণ সে আসার পর পিসিমার হাত অনেক শক্ত হয়েছে। অনেক কিছু চলে গিয়েও যতটুকু যা জমিজমা আছে কে দেখে? কিন্তু কি ভাবে যে দিনে দিনে অনেক কিছুর দায়িত্ব হাতে নিয়েছে ভোলা! আমার সঙ্গে তার ভালবাসার সম্পর্ক।

—রাগ দেখলি কোথায়? আমি বললাম— আমিতো জিজ্ঞাসা করছি কে বলল।

—পরশু দিন চিঠি আনলাম যে গো। হাটে গেছলাম, মাষ্টার বাবু বললেন একটা চিঠি আছে নিয়ে যা। চিঠি এনে মাকে দিলাম, মা পড়ে বলল।

—কি বলল —আমি উদ্‌গ্রীব।।

—ওই, ওইটুকুনই। বলল— তুমি নাকি মায়ের সঙ্গে খু উ-ব ঝগড়া করে এসেছ।

চুপচাপ হাঁটি আমরা। বর্ষায় গাছপালা বেড়েছে খুব। কোথাও কোথাও ঝোপঝাড় গা ছুঁয়ে। চেনাশোনা গাছেদের রাজত্বে চিন্তামগ্ন আমি কাউকেই সম্ভাষণ জানাতে পারছি না। যদিও তাদের দেহের ঘ্রাণ আমাকে উতল করছে।

—ঝগড়া করে এসেছ, কিন্তু তোমারও মনে খুব কষ্ট হয়েছে— হঠাৎ বলল ভোলা— কি যে মনমরা হয়ে রয়েছে! তাই তো মা বললেন— ভোলা, বিলডাঙা যাচ্ছিস ছোটখোকাকে নিয়ে যা। কি হয়েছে গো? মুখখানা কি আয়নায় দেখনা?

—ও কিছুনা রে— আমি মুখভর্ত্তি জঙ্গলে হাত বোলালাম— এবারে আসার সময় দাড়ি কামানোর বাক্সটাই আনতে ভুলে গেছি।

—সে কথা আমি বলছি না ছোড়দা, তোমার চোখের কোলে কেমন কালি পড়েছে দেখেছ?

এসব কথা আমার ভাল লাগছে না মোটেই। আমি সব ভুলে একটু অন্যমনস্ক হতে চাইছি, গাছপালার সাথে একটু একাত্ম হতে চাইছি কিন্তু—

গাছপালার ফাঁক দিয়ে জল দেখা যাচ্ছে, আমরা বিলের ধারে পৌঁছলাম।

একটু দাঁড়াও— বলতে বলতে রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকের ঝোপ ঠেলে এগিয়ে গেল ভোলা, আড়ালে মিলিয়ে গেল। মুহূর্তে আমি একা। বুকের মধ্যে শিরশির করে উঠল কি যে ভাললাগা! আমি বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম। পিসিমা ঠিক বুঝে আমাকে বাইরে ঠেলেছেন। কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে উঠল।

একটা বাঁশের লগি ও একটা ছোট বৈঠা নিয়ে ফিরে এলো ভোলা। পুঁটুলি সামলে বৈঠাটা আমার হাতে দিলো, বলল— চলো।

ঘাটে বাঁধা ডিঙি নৌকা, সাবধানে উঠলাম আমি, দড়ি খুলে ভোলা উঠল, লগি দিয়ে এক ঠেলায় ডাঙা ছেড়ে কয়েক হাত। জল এদিকে কোথাও খুব বেশি নয়, লগি ঠেলেই চলল সে, দূরে ওপারের ডাঙা আমাদের হাতছানি দিচ্ছে। ওটা দক্ষিণ দিক। পূর্ব দিকে অকুল পারাবার, ওদিকে বিল মিশেছে নদীর সাথে। দেখলে ভয় লাগে, আবার মুগ্ধও হতে হয়। আমি চোখ ভরে দেখলাম।

—জল বড় ভয়ঙ্কর গো ছোড়দা— ভোলা বলল— যখন ফুঁসে ওঠে কারো সাধ্যি নেই তাকে আটকায়। তেমন বান তুমি দেখেছ?

আমি ঘাড় নাড়লাম। না।

—দেখতে যেন না হয় গো। আমি দেখেছি। ওই বানেই তো আমার মাকে নিল। ভাঙা কুঁড়েটুকু— তা যে কি করে নিশ্চিহ্ন করে দিল।

চুপচাপ কিছুক্ষণ লগি ঠেলল সে তারপর বলল— এখন আমার বড়ো সুখের দিন ছোড়দা, এখন মা টাকে বড্ড মনে পড়ে। ছোটবেলায় বাপ মরেচে, কি কষ্টে যে মা পেট চালাত। শীতকালে এক এক সময় ফুলকপির পাতা আর মাঠকুড়োনো আলু নুন দিয়ে সেদ্দ করে খেতে হতো। কুঁড়ে ঘরটা হেলে পড়েছিল। একদিকের চালে খড় ছিলো না—

...চারপাশে স্বর্ণশস্য স্তূপ, মাঝে বসে কাঁদে একা শিশু ভোলানাথ, মা গেছে ভাসানে...এত শস্য তবু কেন কাঁদে শিশু ক্ষুধায় কাতর? ও কি শস্য নয়? সোনালী বালুর স্তূপ মরুভূমে?

ভোলার কি চোখ ছলছল করছে? দুঃখের স্মৃতিও মানুষ এমন করে জিইয়ে রাখে!

—কত ঘাট ঘুরে কত কষ্টের দিন কাটিয়ে আমি এখানে মায়ের পায়ে ঠাঁই পেয়েছি ছোড়দা! ওই যে মা বলছিলো না— ভোলা ভাত মুড়ি কুড়িয়ে খাস্ কেন? —আমার বড়ো গা করকর করে গো। কতদিন আমরা মায়ে ব্যাটায় যে শাকপাতা খেয়ে কাটিয়েছি। এখন

যদি আমার মা-টা থাকত!

এমন করে কথা বলে ভোলা বড় মন কেমন করে! মায়ের জন্য মনটা কেমন করে উঠল আমার। আমরা দু'জনেই চুপ করে রইলাম। ওপারে কোথাও ঢাক বাজছে, হালকা আওয়াজ ভেসে আসছে।

—ঢাক বাজছে না? —বললাম আমি।

—হ্যাঁ গো, কালতো ষষ্ঠী—

—তাই না কি? পূজো এসে গেল? —অবাক আমি বললাম।

—আরও? এবার পূজোতো অনেক দেরীতে, কার্তিক মাসের মাঝামাঝি হয়ে গেল গো।

কাল থেকে পুজো শুরু অথচ আমি বাড়ি ছাড়া। পূজোর কদিন আমাকে নিয়েই মায়ের আনন্দ। শুধু পুজোর কদিনই বা কেন— মায়ের জীবনে আমি ছাড়া আর কি আছে? এমনি যখন বেড়াতে বেরিয়ে পড়ি সে এক, কিন্তু এবার? প্রিয় ধন হারিয়ে গেলে দুঃখ বড় হয়, মা যেদিন থাকবে না সেদিন আমি—

কিন্তু না, আমি তো চলেই যাবো— সহসা কি এক অন্য ভাবনা আমাকে কাঁপিয়ে দিলো— আজ তিনদিন ধরে আমি ভীষণ ভাবে মৃত্যুর কথা ভাবছি, ভাবছি, ভাবছি চলে যাবো এই পৃথিবী ছেড়ে কিন্তু মা? মায়ের কথা আমি কি একবারও ভেবেছি? আমি চলে গেলে সে ব্যথা মায়ের বুকে কতখানি বাজবে? বাকি জীবন মা— আমি আর ভাবতে পারলাম না।

কি সুন্দর নীল আকাশ। কি সুন্দর স্বচ্ছ জলের বুকে তির তির ঢেউ। ওপারে গ্রামের ওপর এক সাদা মেঘের পাহাড় আকাশের অনেকখানি জুড়ে। নৌকা এখন একখণ্ড চরের পাশে পাশে। চর জুড়ে কাশবন। হাওয়ায় হাওয়ায় হিল্লোলিত ফুলের রাশি।

একদিন এই পৃথিবীতে আমি থাকবো না কিন্তু এইসব এমনই সুন্দর থাকবে সাজানো সজীব— ভাবতে ইচ্ছা যায় না।

কাশচরের মাঝখানে একটা সরু খাঁড়ির মধ্যে নৌকাটা ঢুকিয়ে দিল ভোলা। দুপাশে দীর্ঘ গাছগুলি গা ঘেঁসে। আমি হাত দিয়ে তাদের সরিয়ে দিই। মাথার ওপর অসংখ্য তুলোর তুলি। আলোছায়াময় এক আশ্চর্য জগতের মধ্যে আমরা কিছুক্ষণ। বুকের ভার অনেক হালকা হয়ে যায়।

কাশবন থেকে নৌকা বেরিয়ে এলো, ডাঙা সামনেই।

চারপাশে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত ছড়িয়ে রেখে মাঝখানে ছোট একটা গ্রাম বিলডাঙা। আলপথে সামনে ভোলা, পিছনে আমি। নৌকা বেঁধে পুঁটুলি খুলে বেরোলো একটা জামা, সে জামা এখন ভোলার গায়ে, হাত ছোট্ট পুঁটুলি। জামা গায়ে দেওয়ার সময় আমার অবাক চোখের দিকে তাকিয়ে ভোলা লাজুক হাসল, বলল শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিতো, তাই।

—আর ওই ছোট পুঁটলি— ওতে কি আছে?

—নারকোল নাড়ু, বউ তৈরি করে দিয়েছে— ওদের জন্যে— লজ্জায় আরও জড়িয়ে গিয়ে বলল ভোলা।

—কিন্তু এখানে কোথায় তোর শ্বশুরবাড়ি? আমি তো এখানে আগেও এসেছি রে! —অবাক আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—ওই'ত হরিদাস বৈরাগী—

সবুজ সম্পদে ধরণী যেন উথলে উঠছে দু'পাশে, ইচ্ছে হয় বুক পেতে শুই। হে পৃথিবীর অধীশ্বর আমাকে তুমি নিঃস্ব করো না। একদিন এই শস্য সুপক্ক হবে, সে মৃত্যু তো শেষ নয়— পরিপূর্ণতা। আমাকে তুমি সেই পরিপূর্ণতায় নিয়ে চল। প্রতিটি মানুষ তার আপন বৃত্তের কেন্দ্রে নিজেই নায়ক, তাদের নিয়েই তো আমার সাধনা। আমাকে সেই সাধনায় উত্তীর্ণ হতে দাও।

আলপথ ছেড়ে আমরা উঠে এলাম গ্রামের রাস্তায়। ঢাকের আওয়াজ এখন অনেক জোর। আমরা বারোয়ারী তলায় এসে পৌঁছলাম।

চালচিত্রের চূড়া থেকে শুরু করে প্রতিমার ত্রিনয়ন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম আমি। গণেশের ইঁদুর আর অসুরের শুঁড়তোলা জুতো আমাকে বাল্যকাল নিয়ে যাচ্ছিল...

...স্কুল থেকে ফেরার পথে রোজ বিকালে পালেদের ঠাকুর দালানে অধীর আগ্রহে গিয়ে দাঁড়াতাম। খড় বাঁধা থেকে শুরু হতো, রোজ দেখতেই হবে কতোটা এগোলো। যেদিন চোখ আঁকা হতো! আহ! যেদিন পরানো হতো ডাকের সাজ! জুতো খুলে পায়ে পায়ে উঠে যেতাম ক-ধাপ সিঁড়ি, শ্বেত পাথরে বাঁধানো কি ঠাণ্ডা ঠাকুর দালানের মেঝে। গোলা পায়রারা কোথায় না কোথায় কোটরে বকম্ বকম্ শব্দ করত, সে শব্দ প্রতিধ্বনিত দেওয়ালে দেওয়ালে...

—চলোগো ছোড়দা— ভোলা ডাকল।

বাল্যকালের সুগন্ধ থেকে উঠে এলাম। আটচালার নীচে শিশুরা ছোটছুটি করছে মহানন্দে, আমারও অমন ছোটাছুটি করতে খুব ইচ্ছা করছিল।

বাড়ির সামনে শাঁখালু লতায় কঞ্চি ধরাচ্ছিলেন হরিদাস, আমাদের দেখে অবাক— আরে বাবা জীবন— ছোটবাবু— কি ভাগ্যি আমার! আমি তো খেয়ে দেয়ে একটু পরেই বেরোবো ভাবছিলুম, মাকে আনতে যাবো। নিরু ধীরুকে বলেছি নৌকো রাখতে— খবর সব ভালোতো?

প্রায় সারাবেলা কাটল মাঠে মাঠে। আসলে ভোলা এসেছে মাঠ ভরা ধান এক নজর দেখাশোনা করতে। পুকুরে স্নান করতে গিয়ে আমি অনেকক্ষণ সাঁতার কাটলাম। কি শান্তির জল! অস্থিরতা যন্ত্রণা সব ধুয়ে যাচ্ছিল। তারপর আহার, খুব তৃপ্তি করে খেলাম আমি।

এখন পড়ন্ত বেলায় ঘাটে বসে আছি— ঘাটে নয় ঘাটে বাঁধা ধীরু নিরুর নৌকায়। আর

আছেন হরিদাস, চলেছেন মেয়েকে আনতে। ভোলা গেছে তার ডিঙি নৌকা আনতে। আমরা এসে ভিড়েছিলাম আঘাটায়। কাশ বনের মাঝে সরু খাঁড়ি দিয়ে আমরা রাস্তা কমিয়ে ছিলাম। এ নৌকোটা একটু বড়, ছইওলা নৌকো, এটা ওপথে যাবে না, কাশবনের ওই চর ঘুরে যেতে হবে।

ভোলা এসে গেল। নৌকা ছাড়ল। আমার দু'চোখে ঘুম নামছে। অনেকদিন আমি ভালো করে ঘুমাইনি। এখন আমার মন জুড়ে কি প্রশান্তি। অনেক কাজ বাকি, সে কাজ শুরু করতে হবে। এইতো এইটুকু জীবন। কিন্তু সব কাজের আগে বড় কাজ ভুল সংশোধন, সে কাজটা সেরে ফেলার জন্য কি যে ব্যস্ততা আমাকে তাড়িত করেছিল।

ছইয়ের ভেতর ঢুকে শুয়ে পড়লাম। দুলছে জল। দুলছে নৌকা। বুকের মধ্যে ছলাৎছল সুখের শব্দ...জন্ম নিচ্ছে নতুন অনুভব...আমি মনে মনে শব্দ সাজাচ্ছিলাম...

...বুকের উপর আছো নৌকার ছইয়ের মতন...

দাঁড় ধরগো, গভীর জল, বাঁশ আর মাটি ছুঁইছে না — কে যেন বলল, শুরু হলো দাঁড়ের বিলম্বিত শব্দ—ছপাৎ ছপাৎ...

স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় আমরা বাড়ি পৌঁছলাম। নিঝুম পুরীর উঠানে দাঁড়িয়ে হরিদাস ডাকলেন— মা জননী আমরা এলাম গো।

কিছুক্ষণ চুপচাপ, আমি ভেতরে গিয়ে পিসিমাকে ডাকব কি না ঠিক করতে পারছিলাম না। কি যেন বাদ্যযন্ত্রের হালকা আওয়াজ ভেসে আসছ— রেডিও বাজছে, এই ডাক কেউ নাও শুনতে পারে।

কিন্তু না, ওই আলো হাতে পিসিমা আসছেন।

দালানে এসে দাঁড়ালেন পিসিমা। সিঁড়ির ধাপে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করলেন হরিদাস, তারপর নিরু ও ধীরু শেষে ভোলা। ওদের একটু পিছনে দাঁড়িয়ে আমি, আমিও মনে মনে প্রণাম করলাম। আজ পিসিমার কাছে বলতে হবে আমার অপরাধের কথা, আমার ভুলের কথা। একমাত্র পিসিমাই পারবেন সমাধানের পথ খুঁজে দিতে। কিভাবে কি করব আমি কিছুই যে ঠিক করতে পারছি না। কিন্তু পিসিমা মনে হয় ঠিক পারবেন। এই যে অনুগত মানুষগুলি— একদিন এরা হয়েছিল পুরোপুরি প্রতিপক্ষ। একদানা ফসলও দিত না। অথচ আজ—

—শরীর কেমন হরিদাস?

—ভালো মা জননী, আপনার আশীর্বাদে আমরা সকলেই ভালো আছি।

—মন্দিরাকে কি নিয়ে যাবে?

—যদি আজ্ঞা করেন!

—নিশ্চয় নিয়ে যাবে, আমিতো বরং ভাবছিলাম হরিদাস আসছে না কেন? বাড়িতে

কিছু —সেজন্যই ভোলাকে দেখতে পাঠালাম। ভোলা, ওদের থাকার বন্দোবস্ত করে দে। তোমার সঙ্গে আরও কথা আছে হরিদাস, সে কথা সকালেই বলব, এখন বিশ্রাম করো।

চলে যেতে গিয়ে ফিরলেন পিসিমা— তুমি ওখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে কেন?

পিসিমার মুখে তুমি ডাক শুনলে আমার বুক কাঁপে, ভাবনা হয়। গুরুতর কিছু না ঘটলে পিসিমা তুমি করে কথা বলে না। আমি পায়ে পায়ে দালানে উঠলাম, পিসিমার কাছে এসে দাঁড়ালাম। এগিয়ে যেতে যেতে গম্ভীর গলা উনি বললেন— তোমার মা এসেছে।

মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত কিন্তু এত কথা মনের মধ্যে ছোটাছুটি করে গেল! মা কেন? কি সংবাদ? মায়ের কি আসার কথা ছিল চিঠিতে? তাই কি পিসিমা আমাকে বাইরে সরিয়ে দিয়েছিলেন? নাকি মা এমনিই এসে পড়েছে? বনশ্রী ভাল আছে?

দাঁড়িয়ে পড়লাম। পিসিমা ডাকলেন— দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? যাক্ শোনো, ওর মন ভাল নেই, তুমি ওর সঙ্গে কোনওরকম বেয়াদপি করবে না।

শুনতে শুনতে আমার মনের মধ্যে তীব্র অভিমান— আমি বেয়াদপ! ঠিক আছে, আমি কারো সঙ্গে কথাই বলব না? মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে আমার ঘরের দিকে চললাম।

সেতারের ঝংকার ভরিয়ে দিচ্ছে অন্ধকারের বিশাল শূন্যতা। তার মানে পিসেমশায়ও ফিরেছেন। পিসেমশায়ের এই সুরঝংকার অমার বুকের মধ্যে কোন জঞ্জাল রাখতে দেয় না, তাঁর ঘরে সামনে দাঁড়াতেই হলো।

—এসো কবি এসো— পিসেমশায় দরাজ গলায় ডাকলেন। আমি ভেতরে এলাম।

— বাঃ! দাড়ি টাড়ি রেখে একেবারে দেবদাস হয়ে গেছ যে হে?

মেঝেতে পাতা জাজিম, পা মুড়ে বসেছেন পিসেমশায়, কোলে সেতারে আঙুলগুলি স্থির।

—থামলেন কেন? —বললাম আমি, খাটে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম এবং ঠিক তখন আমাকে সচকিত করল সেই সুগন্ধ যে সুগন্ধ থাকে বনশ্রীর চুলে। আমার বুক কাঁপছিল।

পিসেমশায় সেতারে মনোনিবেশ করেছেন, আমি ওঁকে এড়িয়ে সাবধানে মুখ নিচু করে বালিশের গন্ধ নিলাম— সেই সুগন্ধ।

তাহলে কি-না তা কি করে হবে! একই সুগন্ধের তেল কতজনতো মাখে, পিসেমশায়ও মেখেছেন। কিন্তু আমার মন মানছিল না, যা অসম্ভব তাই চাইছিল। তারের ঝংকারগুলি সুখের আঘাত দিচ্ছে চেতনায়...

...অস্থির শিয়রে সারারাত জেগে থাকে উদ্যত কামান। মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণের ফাঁকে অস্পষ্ট কবিতার শব্দ দানা বাঁধতে ভেঙে খানাখান। বর্ণহীন অথবা ধূসর এক মহাশূন্যে আমি অন্তরীণ। অলক্ষ্যে কোথায় যেন বয়ে যায় বিধ্বংসী ঝড়, শূন্যে ভাসমান একটি করোটির মধ্যে সেই তীব্র হাওয়া তীক্ষ্ণ শব্দ তোলে, সে কি আমার করোটি? মাংস নেই মেদ নেই রক্ত কিংবা মজ্জা— শুধু এক মনুষ্য কঙ্গাল আমি ভেসে আছি মহাশূন্যে... অন্তরীণ...অন্তরীণ...অন্তহীন কাল ধরে অন্তরীণ...

এভাবেই যন্ত্রণাচ্ছন্ন কেটে গেল সারারাত। গতকাল সারাদিন মাঠে ঘাঠে ঘুরে ঘুরে যে অস্থিরতা যে যন্ত্রণা আমি ঝরিয়ে ফেলে শান্ত হয়েছিলাম সে আবার শতগুণে ফিরে এল রাতে। কাল সন্ধ্যায় মা আমার সাথে একটিও কথা বলেনি। এমনকি খাওয়ার সময়েও না। অথচ আমি এত উদগ্রীব ছিলাম—

ভোরের লাল আকাশ ক্রমশঃ উজ্জ্বল রোদে ভরে উঠছে। রোদের দিকে তাকাতে গেলে চোখ করকর করে উঠল। বিনিদ্র চোখ কি ভারী! অত করে জলের ঝাপটা দিলাম একটুও হালকা হলো না।

জামা গায়ে দিয়ে বাইরে এলাম আমি। দীর্ঘ বারান্দায় ব্যস্ত পায়রার ঝাঁক। আমার পদক্ষেপে তারা উড়ে উড়ে নেমে যায় উঠানে, কিছু উঠে বসে ছাদের কার্নিশে, কিছু ওড়ে— ওই শূন্যে নীলাকাশে... ও কি উড়ে গেল এই ভাঙা পিঞ্জরের থেকে? কতদূরে যাবে পাখি? ভাঙা ডানা বিপর্যস্ত দেহ নিয়ে কতদূর যাবে? ...তবু যায় ..উড়ে যায়... পড়ে থাকে ভগ্ন পিঞ্জর নাকি জীর্ণ কঙ্কাল...ভাঙা পাঁজরের ফাঁকে দিনে দিনে বেড়ে ওঠে সুকোমল ঘাস, বাতাসেতে নড়ে, মুখ ঘসে হাড়ে...না পাথরে...

হাঁটতে হাঁটতে দেখি চলে এসেছি খেয়া ঘাটে। সেই যেদিন এলাম তারপর আর এদিকে আসিনি, আজ অন্যমনে— কিন্তু একি! কোথা সেই মৃত বৃক্ষ? আমি ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে যাই, দেখি একটি চারাগাছ— হ্যাঁ শিমুল। চারাগাছটি কি পাতা নেড়ে আমাকে সম্ভাষণ জানাল?

—দিলুম গো একটা চারা বসিয়ে— নিশানা তো চাই!

মুখ তুলে দেখি নৌকা থেকে নিত্যদা হাঁকছে। ঢালু পাড় দিয়ে আস্তে আস্তে নৌকার কাছে নেমে গেলাম।

—দিলুম বসিয়ে— বলল নিত্যতা— বাপ যাবে সন্তান থাকবে, এইতো নিয়ম? বলো!

দেখনা বড় ছেলে— বলতে বলতে ঘাড় ফিরিয়ে ছইয়ের ওপর বসা যুবকটিকে দেখাল নিত্যদা— এ বছর দাঁড় ধরিয়ে দিলুম।

কচি মুখের সুঠাম যুবক লাজুক হাসছিল।

—কাল কত্তাবাবুর সঙ্গে কারা সব এলেন গো— হঠাৎ প্রশ্ন করল নিত্যদা।

—কারা মানে? মা এসেছে তো—

—আর ওই যে সোনার বরণ এক কন্যে, দুগগা প্রতিমার মতো মুখখানা—

—জানিনা তো— অস্ফুট গলায় কোনক্রমে বললাম আমি, সম্মুখে নদী কি উত্তাল হয় উঠছে?

প্রায় ছুটতে ছুটতে ফটকের কাছে পৌঁছে হঠাৎ আমি থমকে দাঁড়ালাম, এমন লজ্জা করছিল! এবং সঙ্কোচ। এমনভাবে ছুটে চলেছি যেন কিছুই ঘটেনি। কোন মুখে বনশ্রীর সামনে উচ্ছ্বাস নিয়ে দাঁড়াবো আমি?

মন্থর পায়ে ভেতরে ঢুকলাম।

উঠোনে দাঁড়িয়ে হরিদাস ও মন্দিরা, মন্দিরা হরিদাসকে প্রণাম করছিল। পিসিমা এসে দালানে দাঁড়ালেন।

আমাকে দেখে মন্দিরা আরেকটু ঘোমটা দিলো, হরিদাসকে বলল, বাড়িতে এত লোকজন এসেছেন আমি কি করে চলে যাই বলতো? তুমি মন খারাপ করোনা বাবা, লক্ষ্মী পূজোর পর এসে আমাকে নিয়ে যেও।

—আমি কিছু জানিনা হরিদাস— পিসিমা বললেন, মেয়ে যেতে চাইছে না, আমাকে যেন দোষ দিও না।

এই সুখী সুখী নাটকের দৃশ্য দেখতে দেখতে আমার বুক হু হু করে উঠল। কেউ কি আর আমার কথা ভাবছে!

পায়ে পায়ে আমি ভেতরের দিকে চললাম।

—এই যে বাবু, এতটা বেলা হলো পেটে কিছু দানাপানি পড়েছে? —পিসিমা বললেন।

আমি জবাব দিলাম না, যেমন যাচ্ছিলাম তেমনই চললাম।

যথাসম্ভব স্বাভাবিক ভাবভঙ্গি বজায় রেখে আমি এখন এঘর সেঘর ঘুরছিলাম, কিন্তু কোথায় কে?

ঘুরতে ঘুরতে মন্দির ফুলবাগান সব ঘোরা হয়ে গেল, ওদিকে পুকুরের ধার— দেখি যদি ভোলাকে পাওয়া যায়।

এখানে অনেকটা জমি ঝোপঝাড়ে ভর্তি পড়েছিল, কিন্তু কোথায় ঝোপঝাড়, এসে দেখছি সব্জি বাগান। লাউগাছের দুরন্ত যে ডগাগুলি মাচা ছেড়ে ছুট লাগিয়েছে সেগুলিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছিল ভোলা। আমি পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

আরেকবার আমি এই শ্যামলা ছেলেটিকে ঈর্ষা করলাম, অতএব কিছুই জিজ্ঞাসা করা হলো না

—কি গো ছোড়দা? —জিজ্ঞাসা করল সে।

—কিছু না রে। —বললাম আমি, চললাম। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, কে আর আমার কথা ভাবছে!

আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে মন অধীর, অথচ আমাকে থাকতে হচ্ছে শান্ত, নির্বিকার। এমন হতে পারে পিসেমশায়ের সঙ্গে নৌকায় এসেছে এ গ্রামেরই আর কেউ, নিত্যদা ভুল ভেবেছে— ভাবতে গিয়ে আমি হতাশায় ম্লান। আবার বেণুর চুলের সেই সুগন্ধ— সেকথা মনে হতে বুকের মধ্যে আনন্দের—

বেণু! বেণু! আমি মনে মনে ডাকলাম। ফুল বাগিচার মধ্যে দিয়ে ফেরার সময় এদিক ওদিক দেখলাম— কেউ নেই— আস্তে আস্তে উচ্চারণ করলাম— বেণু! বেণু! বেণু! আমার নিজের কণ্ঠস্বর আমারই কানে কি যে সুখ ঢেলে দিল। ইচ্ছা হচ্ছিল খুব জোরে জোরে ডাকি। আমি যদি ডাকি তাহলে কতক্ষণ যে আড়ালে থাকতে পারবে?

বাড়ি আজ সরগরম। এত লোকজন। আর সবাই দেখি খুব ব্যস্ত। জালের বোঝা কাঁধে নিয়ে পুকুরের দিকে চলেছে সুধীর আর কেনারাম, সঙ্গে নিরু ও ধীরু।

—ব্যাপার কি গো কেনা দা? —জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

—এইতো ধীরু ডাকতে গেছল, গিন্নিমা খবর দেছেন মাছ ধরতে হবে।

বাড়ি ঢুকলাম। নিজের ঘরে গিয়ে মুখ গুঁজে বসে থাকা ছাড়া আমার আর কি করণীয় আছে।

সেতারের আওয়াজ ভেসে আসছে। একটানা নয়, দু-একটি টুং টাং বা কয়েক ধাপ সুর, তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। পিসেমশায়ের ঘরের সামনে একটু দাঁড়ালাম। মাঝে মাঝে তারের ওপর গতিময় আঙুল— তারপর খাতায় সুর লিখছিলেন পিসেমশায়। কাছে গিয়ে বসলাম আমি। উনি মুখ তুলে তাকালেন।

—ব্যাপার কি বলত? তুমি বিয়ে করেছ অথচ আমরা কেউ জানিনা— ব্যাপারটা কি? হঠাৎ বলে উঠলেন তিনি।

—বিয়ে? —অবাক আমি কোনক্রমে বললাম— কই না তো!

—সে কি! শুধু করা নয়, দুনিয়ার লোকের কাছে বউকে সঙ্গে করে নিয়ে পরিচয় করিয়েছ। —পিশেমশায় দাপটে বললেন, ঝম্ ঝম্ করে তারের ওপর এক ঝলক ঝড় তুলে দিলেন— কাল রাত্রেই বলব ভাবছিলাম, কথায় কথায় ভুলে গেছি— এটা কিন্তু তুমি খুব অন্যায় করেছ, বাইরের লোকের কাছে চিনতে হবে তোমার বউকে এটা নিশ্চয় আমার কাছে গৌরবের ব্যাপার নয়! একটা আক্ষেপের শব্দ করলেন তিনি, আবারও দ্রুত লয়ে একটা সুর বাজিয়ে দিলেন।

—হ্যাঁ, তোমার বউ আমাকে দিয়ে একটা কাজ করিয়ে নিয়েছে, আর সেটা তোমাকে জানিয়ে দিতে বলেছে— একটু নরম গলায় বললেন পিসেমশায়— তোমার নামে একটা চেক আর দু'খানা ইংরেজি বই কলেজ স্ট্রিটের এক ভদ্রলোককে ফেরৎ দিতে দিয়েছিল, আমি সেটা দিয়ে দিয়েছি, আর বলে দিয়েছি ও কাজটা করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। —কথা শেষ করলেন তিনি, জিজ্ঞাসা করলেন— ঠিক আছে?

আমি সম্মোহিতের মতো ঘাড় নাড়লাম।

—ওখানে গিয়েই জানলাম তুমি বিয়ে করেছ।

একটা কাঁচের পাত্রে চা-পান করেন পিসেমশায়। সেটাকে বড় কাপ না বলে জাগ বললেই মানায়। সেটা পাশেই বসানো ছিল, হাতে নিয়ে শেষ চুমুক দিলেন, নিঃশেষিত পাত্র নামিয়ে রেখে সেতারে নিবিষ্ট আঙুল— চরাচর আশ্চর্য মুর্চ্ছনায় ভরে উঠল।

কি সুর বাজাচ্ছেন উনি? আমার বুকের মধ্যে এমন কষ্ট! রুদ্ধ এক ক্রন্দসী নদী বুক ভেঙে মুক্তি পেতে চায়। আমি বসে থাকতে পারলাম না।

বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়ালাম। নীচে উঠোনে ব্যস্ত পায়রার ঝাঁক। এত ব্যস্ত পায়রারা সারাক্ষণ কি যে খোঁজে। বিশ্ব সংসারে সবাই নিজ নিজ কাজে অমনই ব্যস্ত। আমিই শুধু কাটিয়ে দিচ্ছি অলস বেলা। অথচ কত কাজ বাকি। এইতো, আমার সামনে বিচিত্র পটভূমিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভোলানাথ। ওই যে মাঝি— যে রোপন করেছে ভবিষ্যতের পারের নিশানা— আমার লেখনী তার অপেক্ষায় রয়েছে।

মন্থর পায় নিজের ঘরে এসে দাঁড়ালাম। টেবিলে সাজানো ফুলদানি, নানা রঙ ফুলের স্তবক সুগন্ধ দিয়ে আমাকে স্বাগত জানাল। কি আশ্চর্য! ফুলদানির পাশে রয়েছে আমার প্রিয় কবিতার খাতা! ভুল দেখছিনাতো? খাতার ওপর কম্পিত হাত রাখলাম আমি, নাকি কম্পিত বুকের ওপর রাখলাম শান্ত হাত।

বুকের উপর আছ নৌকার ছইয়ের মতন— মনে মনে বললাম আমি, চেয়ার টেনে বসলাম, খাতা খুললাম।

...নদী বহে যায় নৌকার গভীরে আমি ...ছলাৎছল শব্দ করে জল গভীর মনোনিবেশে শব্দ সাজাচ্ছিলাম...

বুকের উপর আছো নৌকার ছইয়ের মতন<br>
নীচে নদী ছলাৎছল বয়ে যায় অনন্ত বিলাসে<br>
রৌদ্র নয়, রৌদ্রের উত্তাপ ঘিরে থাকে<br>
বৃষ্টি নয়, বৃষ্টির উচ্ছ্বাস ভেসে আসে।

ছুঁয়ে নেই তবু ছুঁয়ে আছি<br>
মাটির একটু দূরে আকাশের একটু কাছাকাছি

দিনে রাতে আঁধারে জ্যোৎস্নায়
তোমার অস্তিত্ব শুধু অনুভবে মিলে মিশে যায়।

সময় থমকে ছিল দীর্ঘক্ষণ

কলম রেখে গভীর প্রশান্তিতে শরীর ছড়িয়ে বসলাম আমি।

পিসিমা ডাকছেন, খাবার জন্য, সত্যিইতো, খুব খিদে পেয়েছে!

খাবার ঘরে বিশাল শ্বেত পাথরের ডিম্বাকৃতি টেবিল যাকে ঘিরে দশটি চেয়ার। কেউ কোথাও নেই। একদার ভরভরন্ত সংসারের নীরব সাক্ষী। একপ্রান্তের চেয়ারে বললাম আমি। ওদিকে রান্নাঘরে নানান শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

পিসীমা নিজেই খাবারের থালা ও জলের গ্লাস নিয়ে এলেন। লুচি, আলুভাজা, বেগুনভাজা, সন্দেশ।

—এত লুচি? আমি প্রতিবাদী।

গম্ভীর মুখে শাসনের চোখে পিসীমা শুধু তাকালেন, বেরিয়ে গেলেন। পুঁঃ! সবাই মিলে দেখছি আমাকে ত্যাগ করে একঘরে করে দিয়েছে! আমার বুক ভারী হয়ে এলো। নিঃশব্দে খেতে লাগলাম। খাওয়ার সময় কেউ কি পাশে এসে বসতে পারে না! কথা নাই বা বলল! ইচ্ছা হচ্ছিল দু'খানা লুচি খেয়ে উঠে যাই, কিন্তু না, পিসীমার রাগ তাহলে আরও বেড়ে যাবে। অতএব বাধ্য ছেলের মতো—

অভিমান নিয়েই ঘরে ফিরলাম। কিন্তু ও কি? কবিতার খাতার নীচে অতবড় ফুলস্কেপ কাগজ এলো কোথা থেকে? খাতা সরিয়ে দেখি বড় অক্ষরে লেখা— কি?

দেখা হবে দক্ষিণের বনে, বাসন্তিকা গাছের তলায় বাসন্তিকা ফুলের সাজে, আজ বিকাল বেলায়।'

এ কি কাগজ? নাকি পাখীর ডানা! আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে— আমি কাগজে ঠোঁটে ছোঁয়ালাম, চোখে, গালে বুকে— এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ।

সে-ই বিকাল! এখনও ক-ত-সময়! কি যে করি!

যাবো অভিসারে! কি হবে পোষাক? মখমলের ধুতি ও উত্তরীয়? গলায় ফুলের মালা, কপালে চন্দনের সাজ!

পায়ে চলা এই সরু পথ এ ছিল এতদিন শুধু আমার, আজ আরেকজনের পদস্পর্শে এ পথ শিহরিত। আমার অজান্তে কখন এসেছে এখানে পরিক্রমনায়! আর আজ...

কি আকুলতা নিয়ে আমি পৌঁছলাম পথপ্রান্তে। এবার ঢিবির ওটুকু উঁচুতে উঠলেই দেখতে পাবো পদতল ফুলে ফুলে ছাওয়া বৃক্ষ, আর বৃক্ষ তলে ... কিন্তু একি? এখানে স্তূপীকৃত পড়ে আছে এতো ফুল! আর তারই পাশে পড়ে আছে সকালের মতোই এতবড় কাগজ, বড় বড় অক্ষরে লেখা—

‘খুলে রেখে তুচ্ছ পোষাক এসো ফুলসাজে!’ স্তূপাকার এ তো শুধু ফুল নয়, এ যে দেখছি ফুলের ঝলর আর মালা সযত্নে গাঁথা! সমস্ত শরীর জুড়ে ছড়িয়ে যায় একি শিহরণ!

আদিম যুগের পুরুষ এক এগিয়ে যায়... কোমরে ফুলের ঝালর, গলায় মালা... চারপাশে বৃক্ষ লতাগুল্মদের হাসাহাসি, কানাকানি। ফিসফাস রঙ্গে তারা ছুঁয়ে দেয় নগ্ন শরীর।

এগিয়ে যাই। কম্পিত পদক্ষেপ। বৃক্ষের ওপাশে তার শরীরের আভাস ও কি বনদেবী?

তার মুক্ত শরীরে শুধুই ফুলের সাজ। কোমরে ফুলের ঝালর...কণ্ঠে, বাহুতে, মনিবন্ধে এলো চুলে জড়ানো ফুলের সাজ...আমি আরও কাছে... বনদেবী বৃন্তচ্যুত একরাশ ফুলের মতো খসে পড়ে আমার বুকের আশ্রয়ে!